কামিয়াবির পথ

মূল

মওলানা তারিক জামিল

ভাষান্তর

মওলানা হেলালুদ্দিন আহমাদ



মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র

بســــــم الله الرحمن الرحيم

মাকামে মুস্তফা (সা.)

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم الا فعلموا انتم من الله على حضر . واعلموا انكم معروضون على اعمالكم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . او كما قال النبى صلى الله عليه وسلم .

দুনিয়া এক অস্থায়ী জগৎ!

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়াতে মানুষের জীবন অস্থায়ী। কিছু মানুষ আমাদের পূর্বে দুনিয়াতে ছিলেন। আজ তারা নেই। তাদের স্থানে আমরা এসেছি। শ্যামল পৃথিবীর বুকে আমাদেরকে স্থান করে দিয়ে তারা চলে গিয়েছেন মাটির নীচের অন্ধকার জগতে। তারপর প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করতে আরেক দল লোক এগিয়ে আসছে আমাদের স্থান দখল করতে। আর আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি শেষ ঠিকানার দিকে। জীবন-মৃত্যু আর আসা-যাওয়ার এক চিরন্তন খেলা চলছে মহান স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্যকে ঘিরে।

আমাদের বিশ্বাস—মৃত্যুর পর এক অনন্ত জীবন রয়েছে। আমরা এক

অন্তহীন জীবনের মুসাফির। মৃত্যুর পূর্বের এ জীবনও আমাদেরকে যেমন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে যাপন করতে হবে, তেমনি মৃত্যুর পরের জীবনের বিভিন্ন ঘাটিগুলো—কবর, হাশর, পুলসিরাত পার হয়ে যেন নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছাতে পারি সে চেষ্টাও করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এমন এক পরিবেশে আমাদের জীবনের উন্মেষ ঘটেছে, যেখানে শুধু মৃত্যুর পূর্বের জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা হচ্ছে। শুধু এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনকেই বড় করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অথচ মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে যখনই দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখনই এ জীবনকে অতি তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ও ধোঁকার জীবন বলে উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, এই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ জীবনের পিছনে তোমরা ছুটে চলেছ!

কোথাও তিনি বলেছেন— وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ এ-জীবন ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। কোথাও বলেছেন—এ দুনিয়া অতি তুচ্ছ। কোথাও বলেছেন—মাত্র দিন কয়েকের ব্যাপার। কোথাও বলেছেন—এখানকার আনন্দ বা বেদনা কোনটাই স্থায়ী নয়। কাজেই, আমরা আমাদের এই অনন্ত জীবনের সীমাহীন সফরের এই ক্ষুদ্র অংশটিও যেমন নিরাপত্তা ও নিরুদ্বেগের সাথে অতিবাহিত করতে চাই, তেমনি মৃত্যুর পরের অন্তহীন যাত্রায়ও আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে বেঁচে চির সুখের জান্নাত লাভ করতে চাওয়া উচিত।

পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি

কম-বেশ আজকের গোটা মুসলিম সমাজই পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মৃত্যুর পরের জীবনের যেমন কোন ছায়া নেই, তেমনি পশ্চিমা শিক্ষাও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরব। আখেরাত সম্পর্কে পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থান একেবারে নিকষ অন্ধকারে। আসলে পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তর-দক্ষিণ যাই বলি না কেন, মানুষের ইল্‌ম ও জ্ঞান আখেরাত সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা দিতে অক্ষম। এ সম্পর্কে মানব-মস্তিষ্ক নিঃশৃত জ্ঞান কিছু বলে না, বলতে পারেও না।

বিগত দু'শ বছর থেকে আমরা যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির রাহুগ্রস্ত হয়ে আছি, এবং আমাদের বিবেক-বিবেচনার চোখে ঠুলি এঁটে নিতান্ত অন্ধের মত যাদের অনুকরণ করে চলেছি, তাদের সংস্কৃতি ও জীবন যাপনের পদ্ধতিতে আখেরাত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত। তারা কেবল দুনিয়ার জীবনকে জৌলুশপূর্ণ করে তোলার পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করে থাকে। আল্লাহ্ পাকের লাখো শোকর যে, আমরা আখেরাতকে অস্বীকার করি না। কিন্তু, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব আমাদেরকে আখেরাত এতটাই ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের জীবন যাপনে তার ন্যুনতম ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। এই যে 'লাহোর' শহরকে তিলোত্তমা নগর হিসাবে গড়ে তোলার ঘোষণা—এটা তো আমাদেরকে শুধু এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, হয়ত নগরের চারিদিকে সবুজের ছড়াছড়ি থাকবে। পাহাড় ও উপত্যকার শ্যামল গা বেয়ে আঁকাবাঁকা ঝরণা ও নদী-নালার কলকল-ছলছল ধারা প্রবাহিত হবে। সড়কগুলো হবে মসৃণ ও প্রশস্ত । ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন থাকবে। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল তথা যাবতীয় নাগরিক সুবিধাদি সুলভ্য করে তোলা হবে।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে বলেছেন—তিলোত্তমা নগরের নির্মাতা পৃথিবীতে তোমরাই একমাত্র নও। তোমাদের পূর্বেও এমন কওম অতিবাহিত হয়েছে, যারা শৈল্পে ও নান্দনিকতায় তোমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও দৃষ্টিনন্দন নগর নির্মাণ করেছিল। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী আরম্ভ করল, তখন فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ আল্লাহ্ পাক তাদের উপর আযাবের এমন চাবুক মারলেন যে, গোটা জাতি তছনছ হয়ে গেল। একটু তাকিয়ে দেখ, সেই সুসজ্জিত বাগিচা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাগিচার ফল ভক্ষণকারীরা কোথায় হারিয়ে গেছে। কুলকুল রবে নির্ঝরণী বয়ে চলেছে এখনো, কিন্তু সেই দৃশ্য অবলোকন করে আনন্দলাভকারীদের আজ কোন অস্তিত্ব নেই। সুদৃশ্য পার্ক, পাঁচ তরকা হোটেল, নৃত্যশালা ও নাট্যশালা এবং আনন্দ-উল্লাশের যাবতীয় উপকরণ পড়ে আছে নিরবে। শুধু সেগুলো ভোগ করার জন্য কেউ আজ আর বেঁচে নেই। এই সুদৃশ্য মহলে এক সময় তারা নেশায় চুড় হয়ে নর্তকীকে বাহুডোরে আবদ্ধ করে পড়ে থাকতো। فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ আমি তাদের সকলকে উঠিয়ে সমুদ্রের প্রবল-প্রচণ্ড ঢেউয়ের কাছে অর্পণ করে দিলাম। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى তোমাদের হৃদয়ে যদি আমার সামান্য ভয়ও থেকে থাকে, তাহলে ভয় করতে থাকো। অন্যথায় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

দুনিয়া ও আখেরাত, এই উভয় জীবনের সুখের জন্য আমরা জীবন যাপনের একটি মনগড়া প্রণালী প্রস্তুত করে নিয়েছি। যেহেতু সেই প্রণালী পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতিপুষ্ট, তাই সে জীবন-প্রণালীতে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য যাবতীয় আয়োজন থাকলেও আখেরাতের কোন স্থান নেই। সন্ধ্যায় পশ্চিমে সূর্য ডুবে গিয়ে যেমন পৃথিবীকে নিকস অন্ধকার উপহার দিয়ে

যায়, পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতিও তেমনি আমাদেরকে কিছু অন্ধকার ছাড়া কোন আলো উপহার দিতে পারে না। তাতে আলো খুঁজতে যাওয়াও বোকামী।

সাফল্য শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথেই

আমরা নিজেদেরকে সেই মহান পথ প্রদর্শকের অনুসারী বলে দাবী করি, যার নূরের কাছে সূর্যও ম্লান হয়ে যায়। যার হৃদয়-প্রদীপ এমন আলোয় বিভাসিত, যে আলোর কাছে মহান আরশের আলোও আলোহীন হয়ে পড়ে। যার জ্ঞান ও দৃষ্টি-ক্ষমতা এমনই প্রখর যে, মসজিদে নববীতে বসেই জান্নাত জাহান্নাম দেখতে পান। আরশ পর্যন্ত যার স্বচ্ছ-দৃষ্টির অবাধ যাতায়াত। আমাদের মত যার দৃষ্টিশক্তি একমুখী নয়, যিনি সামনে পিছনে সমান দেখতে পান। আমরা নিজেদেরকে সেই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী বলে দাবী করি। কিন্তু নিজেদের জীবন-চলার জন্য এমন একটি পথ নির্মাণ করে নিয়েছি, যা তাঁর আদর্শের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা মনে করি—অর্থ-সম্পদ উপার্জন, বিপুল অস্থাবর সম্পদের উপর অধিকার অর্জন, এবং নিত্যনতুন ও উন্নত টেকনোলজি অর্জন—এই বিষয়গুলোই মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে। যদি তাই হবে, তাহলে উন্নত অর্থনীতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অধিকারী জাপানবাসীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মাঝে এমন ব্যাপক হারে আত্মহননের প্রবনতা কেন ? কোন্ দুঃখে, তাদের ভাষায়, এই আরাম-আয়েশের জীবন ও মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করে তারা চলে যেতে চায় ? ইউরোপবাসীদের কাছে গিয়ে দেখুন, তাদের চাকচিক্যময় জীবনের আড়ালে কী করুন হতাশা আর গ্লানী লুকিয়ে আছে!

আল্লাহ্‌কে হারিয়ে কেউ কি কখনো সঠিক গন্তব্যের সন্ধান পেয়েছে, না পেতে পারে ? আর মহান রাব্বুল আলামীনের করুণা অর্জন করার পর কারো জীবনে কোন অপ্রাপ্তি রয়েছে বলেও তো কোন নজীর নেই। আসলে আল্লাহ্‌কে যে পায় নি, তার জীবনেই প্রাপ্তির ঘরটি শুধুই শূন্য।

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে এক এক করে প্রতিটি লাইন পড়ে দেখুন। দেখুন তো এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি না, আল্লাহ্ পাকের করুণা লাভ করার পরও যিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কিংবা আল্লাহ্‌কে না পেয়েও যিনি জীবনে সফল হয়েছেন ? আসলে সঠিক পথের দীশা পাবার জন্য প্রথমে সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন। তারপর অনুসরণের জন্য সঠিক পথপ্রদর্শক নির্বাচন করুন। এ জীবন-পথে চলার জন্য আমাদের সামনে রয়েছে দু'টি পথ। একটি পথের নির্মাতা হল দুনিয়ামুখী মানুষ। আরেকটি পথ অতুলনীয় দিশারী, ফখরে দু'

'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপহার। সে চলার পথে মানুষের নির্বিঘ্ন চলার গতিকে রোধ করার জন্য কখনো রাতের আঁধার নেমে আসে না। সে পথে শুধু আলোই আলো। তিনি বলেন—جئتكم بخير الدنيا والاخرة হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের পার্থিব জীবনকেও সুন্দর করে দিব, তোমাদের আখেরাতের জীবনকেও সুন্দর করার উপায় বাতলে দিব। শুধু তোমরা আমাকে অনুসরণ করে চল।

গোটা মানব জাতির সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ্ পাকের হাতে। আর আল্লাহ্ পাক সে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বানিয়েছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সাফল্য লাভের একমাত্র মাধ্যম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মানুষ দুনিয়ার কামিয়াবী কামনা করুক চাই আখেরাতের কামিয়াবী কামনা করুক, তাকে মুহম্মদী পথেই আসতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিম তথা তাঁর আদর্শকে এড়িয়ে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। যাবতীয় সাফল্যের একমাত্র চাবি তিনিই। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তি যে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আর কারো পক্ষেই তাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তিনি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। তাঁর উসিলায় উম্মতে মুহাম্মদীও এত সম্মানিত যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আর কোন উম্মতের জন্য জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি হবে না। তাসনীম, সালসাবীল, যান্‌জাবীল, রহীক—জান্নাতী এসকল সরবত যতক্ষণ না নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আর কারো জন্যই পানের অনুমতি হবে না। এই সরবত উম্মতে মুহম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ না পান করবে, ততক্ষণ আর কোন উম্মতই পান করতে পাবে না।

সমস্ত ইয্‌যত-সম্মানের খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।

সমস্ত কামিয়াবীর খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।

বরকতের খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।

সরদারির খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।

জান্নাতের খাজানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।

মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে। তার সেই খাযানা লাভ করার জন্য আল্লাহ্ পাক একটি উপায় নির্ধারণ করেছেন। সে উপায়টি হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

আদর্শের অনুসরণ। সেই আদর্শের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে 'মুহম্মদী' রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহলে আপনাদেরকে আল্লাহ্ পাক এমনই সম্মান দান করবেন যে, আপনাদের জন্য তাঁর অফুরন্ত সম্মানের খাযানা খুলে দিবেন। কামিয়াবীর খাযানা করায়ত্ব করতে চাইলে আল্লাহ্ পাক তাও আপনাদের জন্য সহজলভ্য করে দিবেন। আপনাদের জন্য বরকতের দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দরজা থেকে আপনাদেরকে আহ্বান করা হতে থাকবে। সেখানে আপনাদের এস্তেকবালের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উপস্থিত থাকবেন। তবে শর্ত একটাই—নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে জীবনে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। এই একটি মাত্র উপায় ছাড়া আত্মীয়তার দোহাই বা খান্দানী মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যাবে না। সেখানে সৈয়দ বা কোরায়শী মুদ্রা অচল। একমাত্র মুহম্মদী মুদ্রা ছাড়া সেখানে আর কিছুই চলে না। আবু লাহাব কুরায়শী ও হাশেমী ছিল। শুধু তাই নয়, আত্মীয়তার সম্পর্কে খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাও ছিল। তা সত্ত্বেও কোরআন তার সম্পর্কে ঘোষণা করেছে— تبت يدا ابى لهب وتب আবু লাহাব ধ্বংস হয়েছে। আবু লাহাব নিজে হাশেমী, আর তার স্ত্রী ছিল বনু উমাইয়্যা খান্দানের। ইয্যত-সম্মানে হাশেমীদের পরেই যাদের অবস্থান। স্বামী-স্ত্রীর আকাশ-ছোঁয়া বংশীয় মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন—وامرأته حمالة الحطب তার স্ত্রীও জাহান্নামী। কে কার আত্মীয়, আর কে বংশ মর্যাদায় কত উচ্চ, আল্লাহ্ পাকের নিকট এসব কিছুই বিবেচ্য নয়। তিনি শুধু দেখেন, তাঁর কোন বান্দা তাঁর পেয়ারা নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম, আর কে নয়। কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে, আর কে অবাধ্য হয়েছে। যে আনুগত্য স্বীকার করেছে, সে কামিয়াব। আর যে অবাধ্যচারণ করেছে, সে নাকাম ও ব্যর্থ।

মুহম্মদী আদর্শ অর্জনের মেহনত

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যেহেতু আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যিন্দেগী শিখি নি, সে অনুযায়ী আমরা নিজেদেরকে পরিচালিত করি নি, এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী হিসাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর দ্বীন ও আদর্শকে প্রচারের কাজে অংশ গ্রহণ করি নি, তাই আমাদের জীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত একটি জীবন। এ ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে আমাদেরকে আলোর জগতে বের করে আনার জন্যই তাবলীগের মেহনত। তাবলীগ প্রথাগত কোন দল বা আন্দোলন নয়। আমাদের কোন সদস্য নেই, কোন মেম্বার নেই, কোন সদর, সেক্রেটারি বা কোশাদক্ষও নেই। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, প্রতিটি মুসলমান যেন মুহম্মদী আদর্শে আদর্শবান হয়ে ওঠে। এ দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের। এটা 'তাবলীগ জমাত' নামে কোন বিশেষ দলের নিজস্ব কার্যক্রম নয়।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় হবার পথ

এ কথাটিই হযরত আলী (রাযি.) অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—যে ব্যক্তি খান্দানী আভিজাত্য ছাড়া সম্মানী হতে চায়, অর্থবিত্ত ছাড়া ধনী হতে চায় এবং ক্ষমতা ছাড়া প্রতিপত্তি চায়, তার কী করণীয় ?

ইয্যত-সম্মান সকলেই চায়। আমিও চাই। এ চাওয়ায় দোষের কিছু নেই। ধনী হবার আকাঙ্ক্ষাও প্রায় সকল মানুষই পোষণ করে থাকে। নিজ পরিমণ্ডলে মানুষ প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের আশাও করে। কিন্তু সেই আশা পুরণ হবার উপায় কি ?

এ উদ্দেশ্যে শয়তান একটি পথ তৈরী করেছে—মারামারি, হানাহানি, অবৈধ অর্থের ছড়াছড়ি আর নোংরা রাজনীতি—ইত্যাদির সমন্বয়ে এক হুলুস্থুল পথ।

আর একই উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রাযি.)-এর যবানে মহান রাব্বুল আলামীনের পয়গাম শুনুন। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَرَادَ عِزًّا بِلَا عَشِيْرَةٍ وَ غِنًى بِلَا مَالٍ وَ جَاهَةً بِلَا اِخْوَانٍ فَلْيَخْرُجْ
مِنْ ظِلِّ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِلٰى عِزِّ طَاعَةِ اللّٰهِ.

সম্মান, ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি চাও ? তাহলে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা ছেড়ে ফরমাবরদারীর আলোকিত পথে চলতে আরম্ভ কর। তাহলেই লাভ করতে পারবে ইয্যত-সম্মান, ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি। এই দুনিয়া তোমার পদপ্রান্তে এসে নতজানু হবে এবং জান্নাতের চাবিও তোমার হাতে তুলে দেয়া হবে।

ঐশী-ভাষ্যে সীরাতে মুস্তফা

মানুষ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হতে পারবে ? আল্লাহ্কে তো দেখা যায় না। তাঁর পয়গামও মানুষ শোনতে পায় না। তাহলে এর উপায় কি ? এ সমস্যার সমাধানকল্পে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দা ও তাঁর মাঝে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে উপস্থিত করলেন।

আসমান থেকে ওহী আসল। মানুষ জানতে পারল আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের কথা। আল্লাহ্ পাক পেয়ারা নবীর নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করলেন—

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۞

আপনি গোটা জগদ্বাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। আপনি কোন বিশেষ ভূখণ্ড বা জনগোষ্ঠির নবী নন। আপনার নবুওয়াত মানব-দানবসহ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

আপনার অস্তিত্ব গোটা সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত স্বরূপ। আপনি দয়ার আঁধার। আপনাকে এমন কিতাব দান করেছি, যা আর কাউকে প্রদত্ত হয় নি। আপনাকে এমন দ্বীন দান করেছি, ইতিপূর্বে যা আর কোন নবীকে দেই নি। আপনার দ্বীনই শ্রেষ্ঠ দ্বীন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আপনার নবুওয়াতের মাধ্যমেই নবুওয়াতের ক্রমধারা পূর্ণতা লাভ করল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই দয়ালু ছিলেন যে, তাঁর দয়া দ্বারা দুনিয়ার মানব-দানবসহ গোটা মাখলুকাত যেমন উপকৃত হয়েছে, তেমনি আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত উপকার লাভ করেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ফরিয়াদী উট

একবার একটি উট ছুটতে ছুটতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে উপস্থিত হল। সেখানে এসেই উটটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকে মাথা রেখে দিয়ে কাঁদতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, উটটি কি বলছে তোমরা কি তা বুঝতে পারছো ? সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বাকহীন প্রাণীর ভাষা আমরা কেমন করে বুঝবো ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, উটটি বলছে, যৌবনে যখন আমার দেহ শক্ত-সমর্থ ছিল, তখন আমার মনিব আমাকে দিয়ে কাজ আদায় করেছে। আজ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। দেহে আগের সেই পরিশ্রম করার সামর্থ নেই। তাই মনিব আমাকে জবাই করতে চাচ্ছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার জীবন রক্ষা করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মালিককে বললেন, উট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। সাহাবী জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য

আমি প্রস্তুত রয়েছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উটটিকে মুক্ত করে দাও। ফলে সাহাবী উটটি ছেড়ে দিলেন। এক নির্বাক প্রাণীও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা লাভে ধন্য হল এবং আনন্দ ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে গেল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক নিষ্প্রাণ খুঁটির ভালবাসা

মসজিদে নববীতে মিম্বর নির্মিত হয়েছে পঞ্চম হিজরীতে। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বৃক্ষের একটি শুষ্ক খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরে মিম্বর নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিলে সে খুঁটির পাশেই তা নির্মাণ করা হল। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পর প্রথম জুম'আয় খুৎবা দেবার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুষ্ক খেজুর কাণ্ডটি অতিক্রম করে মিম্বরের প্রথম ধাপে কদম রাখলেন, তখন সেই নিষ্প্রাণ কাণ্ডটি বুঝতে পারলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই বিরহ তাকে অসহনীয় বেদনায় রোদন-কাতর করে তুললো। গর্ভবতী উটনী যন্ত্রণায় যেভাবে চিৎকার দিয়ে ওঠে, নিষ্প্রাণ খেজুর কাণ্ডটি ঠিক সেভাবেই চিৎকার করে ওঠলো। দয়াল নবী ফিরে আসলেন। তার গায়ে স্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। কানে কানে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা রফা হয়ে যাক—আজ তুমি আমাকে যেতে দাও। তোমাকে জান্নাতের বৃক্ষরূপে পুণর্জীবন লাভের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ফলে বৃক্ষ-কাণ্ডটির কান্নার দমক ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই বৃক্ষ-কাণ্ডটি বের করে নিয়ে দাফন করে দাও। এটি জান্নাতের বৃক্ষরূপে পুণর্জন্ম লাভ করবে এবং অনন্তকাল ধরে জান্নাতবাসীরা তার ফল ভক্ষণ করতে থাকবে। তিনি আরো বললেন—

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ اَحْتَزِنْهُ لَمْ يَزَلْ بَاكِيًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ
اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই বৃক্ষ-কাণ্ডটিকে স্নেহে আলিঙ্গনে শান্ত্বনা না দিতাম, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আমার বিচ্ছেদে এইভাবে চিৎকার করে সে কাঁদতে থাকতো।

আফসুস! যেখানে একটি খেজুর বৃক্ষের নিষ্প্রাণ কাণ্ড নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে, সেখানে আমরা মানুষ হয়েও তাঁর তরীকাকে বিসর্জন দিয়ে চলেছি। শুধু নাম 'গোলাম রাসূল' দিয়ে গোলাম হওয়া যায় না। গোলামী একটি জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি আদর্শের যথার্থ অনুসরণ।

তাবলীগ ঃ সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি মেহনত

তাবলীগ মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গঠন ও সে আদর্শের বাণী গোটা জগতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মেহনত। এটা শুধু বলার দ্বারা হয় না ; বরং প্রথমে হৃদয়ে নবী-প্রেমের আবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তারপর আনুগত্য এবং নবীর বাণীকে দুনিয়ায় প্রচারের মেহনতে অংশ নিতে হয়। এই দায়িত্ব আমরা নবীর কাছ থেকে মিরাসী সূত্রে লাভ করেছি। আল্লাহ্‌র নবী আমাদেরকে মিরাস স্বরূপ দান করেছেন দ্বীন, আর আল্লাহ্ পাক দান করেছেন আসমানী কিতাব। আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও আল্লাহ্‌র নবীর দ্বীনের ওয়ারেস। আমরা আখেরী নবীর নায়েব। তাঁর নবুওয়াত শুধু মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয় ; বরং তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণও যেমন আবশ্যক তেমনি তাঁর আদর্শকে গোটা জগতে পৌঁছে দেয়াও অপরিহার্য কর্তব্য। এরই নাম তাবলীগ।

নামাযীদেরকে 'নামাযী জামাত' বলা যেমন ভুল, তেমনি তাবলীগকে 'তাবলীগ জামাত' নামে আখ্যা দেয়াও ভুল। 'তাবলীগ জামাত' এই নামটি আমাদের দেয়া নয়। লোকেরা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বলতে শুরু করেছি। তাবলীগ মূলতঃ সকল মুসলমানেরই কাজ। প্রতিটি মুসলমানের উপর নামায-রোযা যেমন ফরয, তাবলীগের কাজও তেমনি ফরয। মানুষ সেটা পালন করুক চাই না করুক, তাদের সে দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তাদের অব্যাহতি নেই। তাবলীগের এই দায়িত্ব স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

আমার পয়গাম গোটা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়া আমার উম্মতেরই দায়িত্ব। কাজেই এই দায়িত্ব আমরা কোনভাবেই এড়াতে পারি না। গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষও যদি এ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করতে থাকে, তাতেও যেমন এ দায়িত্ব থেকে আমাদের অব্যাহতি নেই, তেমনি সকল মানুষ যদি এ দায়িত্বের প্রতি

নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে, তাতেও আমাদের অব্যাহতি নেই। নামাযের মত তাবলীগের যে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে রয়েছে, তা আমাদেরকেই আঞ্জাম দিতে হবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানী

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার জন্য একশত উটের বহর নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হলেন। সেই বহর থেকে একেকবারে পাঁচটি করে উট পৃথক করে নিয়ে যাওয়া হত। সেখান থেকে একটি একটি করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হত আর তিনি তা জবাই করতেন। সেই পাঁচটি উট থেকে যখন একটিকে জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত, তখন অন্য চারটি অগ্রসর হয়ে বলত, আমাকে আগে জবাই করুন, এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে এ নিয়ে কামড়াকামড়ি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিত। এই যমীন, আকাশের সূর্য এবং আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য মাখলুক সাক্ষী আছে, সেদিন উটগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কুরবানী হওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে আসতে চাইছিল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের বরকত

কুরবানী শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আম্মার বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাযি.)-কে ডাকলেন এবং তার সামনে মাথা পেতে বসলেন চুল কাটার জন্য। তারপর বললেন, মু'আম্মার! চুল কাটার জন্য রাসূল তোমার সামনে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমার হাতে ক্ষুর। হযরত মু'আম্মার (রাযি.) বললেন, আয় আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা একান্তই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইহ্সান। এতে আমার কামালাত কিছুই নেই। যাই হোক, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে মাথা মুণ্ডন করালেন। পাশেই হযরত আবু তালহা (রাযি.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত চুল তার হাতে অর্পণ করে দিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযি.) তার হাত থেকে থাবা দিয়ে কপালের কিছু চুল ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন এবং সেই বরকতময় চুল তিনি নিজের টুপির মধ্যে সযত্নে রেখে দিলেন। এঘটনার পর কোন যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে প্রথমে তিনি সেই টুপিটি মাথায় পড়তেন, তারপর লোহার শিরস্ত্রাণ দিয়ে তা ঢেকে দিতেন।

আলেমগণ বলেন, শত্রুপক্ষের বড় বড় বীরদের সঙ্গে হযরত খালেদ (রাযি.) লড়াই করে তাদেরকে কচুকাটা করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র চুলের বরকতে।

ইয়ারমুকের লড়াইয়ে রোমানদের আক্রমণ যখন একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, হযরত খালেদ (রাযি.) সেই কঠিন মুহূর্তেও অস্ত্র ধারণের প্রতি মনোযোগী না হয়ে তাঁর টুপিটি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু পাওয়া গেল না। সঙ্গী সর্দাররা বলতে লাগলেন, শত্রু ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, আর ওনার কিনা এখন টুপি খোঁজার সময় হল! তারা বললেন, টুপি পরে খুঁজে দেখা যাবে। আগে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করুন। শত্রু অগ্রসর হয়ে একেবারে তাদের খীমার উপর এসে পড়লো। ছুটাছুটি আর দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে হঠাৎই তার সেই পুরাতন ও ময়লা টুপিটি পাওয়া গেল। তা দেখে সকলেই বলতে লাগল, এই সামান্য একটি টুপির জন্য তুমি প্রাণের উপর এত বড় ঝুঁকি নিলে? জবাবে তিনি বললেন, আরে আল্লাহ্র বান্দারা! জান কি এ টুপির মধ্যে কী রয়েছে? এই টুপির মধ্যে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক রয়েছে। এই টুপি মাথায় ধারণ করা ছাড়া আমি কখনো শত্রুর মোকাবেলায় যাই না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা সীরাত

তাবলীগের এই মহান কাজ নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব হবার সুবাদেই আমরা লাভ করেছি। গোটা পৃথিবী একজন রাহ্বারের অধীর অপেক্ষায় আছে। পার্থিব ব্যস্ততার কারণে আমরা দ্বীনের কাজের জন্য অবসর পাই না। কিন্তু ব্যস্ততা যতই জটিল হোক, অবসর বের করে নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নিয়ে আমাদেরকে গোটা দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের প্রতিটি সুন্নতকে কিতাবের পাতায় ও মানুষের অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। প্রায় চৌদ্দশ তেইশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আজ পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছুই কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর অল্প কিছু কথাই মানুষ জানে। হযরত মূসা (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমায়ীল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) ও অন্যান্য নবীদের সামান্য কথাই ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে।

কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্ব থেকে নিয়ে শেষ বিদায় পর্যন্ত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি অংশের বিবরণই সংরক্ষিত

রয়েছে। সেই সংরক্ষিত ইতিহাস আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নি। নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই উটনীতে আরোহণ করতেন, সেই উটনীগুলোর নাম পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। কবে কখন কোন উটনীর উপর আরোহণ করতেন তাও কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে—নবম ও দশম তারিখে তিনি কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম সমাধা করেছেন। তওয়াফ করতে যাবার সময় জাদ'আ নামক উটনী ছিল তার বাহন। আর এগার তারিখে আয্বা বা জাদ'আ নামক উটনীর উপর আরোহণরত অবস্থায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, বরং সেসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর লাগাম কার হাতে ছিল, ইতিহাস তাও সংরক্ষণ করে রেখেছে। প্রথম দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে ছিল তাঁর উটনীর লাগাম। আর সেই সভাস্থলে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত রাবি'আ ইবনে উমাইয়্যা (রাযি.)। আমাদের ইজতেমায় যেমন বলা হয়, 'খামুশ হয়ে যাই, চৌকান্না হয়ে যাই', হযরত রাবি'আ (রাযি.) তেমনি সব ঘোষণা দিয়ে মানুষকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণের প্রতি মনোযোগী করেছেন। নবী-জীবনের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোও কালের ব্যবধান আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন, সেদিন 'আযবা নামক উটনীটি তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় খুবই কাতর হয়ে পড়ে। এমনকি পানাহার পর্যন্ত ত্যাগ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিহনে শূন্য পৃথিবীতে উটনীর জীবন অসহনীয় হয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ অনাহারে কাতর হয়ে একদিন উটনীটি মারা যায়।

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

আমাদের কাছ থেকে কোরআন ছিনিয়ে নেবার সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই বাতেল শক্তি করেছে। কিন্তু একটি হরফ বা অক্ষরও ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের অনেক পরে হাদীসসমূহ কিতাব আকারে সন্নিবেশীত হয়েছে। সেই হাদীসের সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে আমাদের মাঝে দ্বিধা সৃষ্টির অনেক চেষ্টাই বাতেল শক্তি করেছে। তাতেও তারা সফল হয় নি। মেহেরবান আল্লাহ্ আমাদের কাছে হক প্রকাশ করে দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত হয়েছেন চৌদ্দশ তেইশ বছর অতিবাহিত হতে চলল, অথচ আজ আমি তাঁর জীবনী সম্পর্কে

আপনাদের সামনে এমন স্পষ্ট আলোচনা করছি, যেন এই মাত্র তিনি আমাদের কাছ থেকে ওঠে গিয়েছেন। যেহেতু উম্মতে মুহম্মদিয়ার দায়িত্ব হল নবীজীর সমস্ত বাণী আগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, তাই তাঁর কোন বিষয়ই হাদীসের বিবরণ থেকে বাদ পড়ে নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার ভঙ্গি ছিল বিনীত। তিনি কখনো পা ঘষটে চলতেন না বরং পা উঁচিয়ে কাঁধ ঝুঁকিয়ে কোমল ভঙ্গিতে হাঁটতেন। মানুষ যতই বুক চিতিয়ে আর নাক উচিয়ে চলুক না কেন, পাঁচ ছ' ফিটের চেয়ে বেশী উঁচু হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর চলার ভঙ্গি যদি বিনীত হয়, তাহলে পাঁচ হাজার ফিট ওপরে ওঠাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। দম্ভ মানুষকে অপদস্ত করে, আর বিনয় দান করে মর্যাদা।

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা চাইতেন এবং দু'আ করে বলতেন—

وَاغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

আয় আল্লাহ্! কেয়ামতের দিন আমার ভুলত্রুটি মাফ করে দিন। অপরপক্ষে আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ *

আল্লাহ্ পাক আপনার পূর্বাপর সকল ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অপরাধ করেছেন, আর আল্লাহ্ পাক তা মাফ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সৃষ্টিগতভাবেই ছিলেন নিষ্পাপ ও পুত চরিত্রের অধিকারী। আয়াতের উদ্দেশ্য হল, নবীজীর মনে কখনো যদি কোন পাপ-চিন্তার আভাসও আসত, এবং সে সম্ভাবনা যদিও নেই, আল্লাহ্ পাক অগ্রিম তাও মাফ করে রেখেছেন।

এক নবী আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা লাভের জন্য আকুতি জানিয়ে দু'আ করেছেন, আর এক নবীকে আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমি আপনাকে মাফ করে দিয়েছি। এক নবী দু'আ করেছেন— وجعلنى من ورثة جنة النعيم আয় আল্লাহ্! আমাকে জান্নাত দান করুন। আরেক নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ পাক বলেছেন—انا اعطينك الكوثر আমি আপনাকে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছি। একথা বলেন নি যে, আপনাকে জান্নাত দান করা হবে। আয়াতের তরজমায় সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ, 'আমি আপনাকে হাউজে

কাউসার দান করেছি'—আসলে উদ্দেশ্য তা নয়। বরং এখানে উদ্দেশ্য হল, 'আমি আপনাকে জান্নাত দান করেছি।' আর তাতে হাউজে কাউসার নামে অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুও রয়েছে। মূলতঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান এতই সুউচ্চ যে, তাঁকে ছাড়া কারো পক্ষেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। সেই সম্মানি নবী যখন তাঁর সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে চলতেন, কখনো আগে আগে চলতেন না, তিনি থাকতেন পিছনের দিকে। এতই ছিল তাঁর বিনয়।

এত সম্মান যে নবীর, তিনি কেন সাহাবাদের পিছনে থাকতেন ? এর কারণ, যদিও তাঁর মহান চরিত্রে অহংকারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবুও অহংকারের সম্ভাব্য সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত সম্মান করেন যে, গোটা কুরআন মজীদে কোথাও একবারের জন্যও তাকে নাম নিয়ে ডাকা হয় নি। অথচ অন্যান্য নবীদেরকে তিনি নাম নিয়েই ডাকতেন। যথা—

ইয়া দাঊদ!
ইয়া মূসা!
ইয়া ঈসা!
ইয়া আদম!
ইয়া ইয়াহ্ইয়া!
ইয়া যাকারিয়্যা!
ইয়া ইবরাহীম!
ইয়া নূহ্!

কোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আট নবীর সঙ্গে কথা বলার বিবরণ দিয়েছেন এবং সকলকেই তিনি নাম নিয়ে ডেকেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি যতবারই আহ্বান করেছেন, একবারও তাকে ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাকেন নি। বরং নবীজীকে আহ্বানের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা ছিল—

ইয়া আইয়্যুহার রাসূল!
ইয়া আইয়্যুহান্ নবী!
ইয়া আইয়্যুহাল্ মুয্যাম্মিল!
ইয়া আইয়্যুহাল্ মুদ্দাস্সির!

শুধু তাই নয় ; বরং আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর রাসূলকে সসম্মান-

সম্বোধনের তাকীদ করে বলেছেন—

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ❊

তোমরা যেমন পরস্পরকে নাম নিয়ে ডেকে থাক—ইয়া আবূ বকর, ইয়া ওমর, ইয়া উসমান, ইয়া আলী, আমার নবীকে তেমনিভাবে 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে ডেকো না। এভাবে বলা অশিষ্টাচার ও বেআদবী। তাকে ডাকবে 'ইয়া আইয়্যুহার্ রাসূল', 'ইয়া আইয়্যুহাল্ মুদ্দাস্সির' বলে। মুদ্দাস্সির শব্দের প্রচলিত অর্থের বাইরে আমি অন্য একটি অর্থ বলছি, শুনুন। শব্দটির উৎপত্তি دثر থেকে। একই শব্দমূল থেকে تدثير শব্দের উদ্দেশ্য হল—ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব খড়কুটোর বাসা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে অসহায় পাখিটিকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দিয়ে গেল। শোকার্ত পাখি উড়ে গিয়ে আবার চঞ্চুর ফাঁকে একটি একটি করে খড় এনে ভাঙ্গা ঘর মেরামত করল। আবার ফুটে ওঠলো তার কণ্ঠে সুরেলা গান। পাখীর সেই বাসা পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'তাদসীর'।

হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর ছয়শ দশ বছর পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন হলো না। নবীহীন অভিভাবক শূন্য গোটা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ্ পাক সেই লণ্ডভণ্ড পাখীর বাসার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, জগৎ জুড়ে প্রচণ্ড শয়তানী ঝড় উঠেছিলো, কুফর ও যুলমতের প্রচণ্ড তাণ্ডবে হযরত ঈসা (আ.) ও এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের সযত্ন-নির্মিত বাসাটি লন্ডভন্ড হয়ে গোটা মানবতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। অতঃপর আখেরী নবী সেই লন্ডভন্ড বাসাটি পুনঃনির্মাণ করলেন। তাই তাকে বলা হল—يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে মানবতার পুনঃনির্মাণকারী! আসুন, উঠুন, দাঁড়ান। আপনার রবের বড়ত্বের কথা বলুন। আপনার বরকতে বিপর্যস্ত মানবতার ঘর পুনঃনির্মিত হবে। আবার আলোয় ঝলমল করে হেসে উঠবে। এভাবেই আল্লাহ্ পাক আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানের উচ্চাসন দান করেছেন।

কামিয়াবীর পথ

আমরা আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। আমাদের এই উত্তরাধিকার অর্থ-সম্পদ বা স্বর্ণ-রৌপ্যের নয়। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারী। নবীর সেই আদর্শ নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার দায়িত্ব মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে দান করেছেন। আমি যে আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারছি,

আল্লাহ্ পাক তাঁর জীবনী সংরক্ষণ করার ফলেই তা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যেহেতু তার জীবন ও জীবনাদর্শ কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাক তার জীবনাদর্শ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে মজলিশে উপবেশন করতেন, কিভাবে লোক সমাজে কথা বলতেন, কিভাবে মানুষের দিকে ইশারা করতেন, কথা বলার সময় কিভাবে হাত নাড়তেন, তাঁর আনন্দ বা ক্রোধের সময় তার চেহারায় কি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠতো, হাদীসের কিতাবে সব কিছুই সংরক্ষিত আছে। এটা আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি আচরণ আমাদের জন্য সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে শত শত বছর ধরে তা মানুষের মাঝে প্রচার হয়ে আসছে। আমরাও আল্লাহ্র ফযলে তা আপনাদের সামনে বলতে পারছি এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের জীবন গঠন করাও সহজ হয়ে গিয়েছে। এটাই আমাদের কাজ। এটা কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর কাজ নয়, সকল মুসলমানের দায়িত্ব। আমরা 'তাবলীগ জামাত' নামে কোন বিশেষ দল নই। আমরাও মুসলমান, আপনারাও মুসলমান। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি সে দায়িত্ব আপনাদেরও। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সে কর্তব্য আপনাদেরও। এখানে কোন দল বা জামাতের প্রশ্ন আসে কেন! আমাদেরকে একটা ভিন্ন দল বা ফেরকা হিসাবে আপনারা কোন যুক্তিতে সাব্যস্ত করছেন?

আমি তো আপনাদের সামনে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই বলছি। মানুষ কিভাবে সফল হতে পারবে? প্রকৃত সাফল্য মানুষের জীবনে কোন্ পথে আসবে? এটাই আমার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নমুনা রেখে গিয়েছেন। তাঁর অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা ও আচার-আচরণ-সহ জীবনের প্রতিটি বিষয়ই সংরক্ষিত আছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেবাস-পোশাকে দারিদ্রতার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে পোশাক কখনো অপরিচ্ছন্ন ছিল না। শতছিন্ন তালিযুক্ত পোশাক তাঁর অঙ্গে শোভা পেত সত্য, কিন্তু সে পোশাক কখনো মলিন থাকতো না। কাজেই টুপি-পাগরী তেল চিটচিটে ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা কোনভাবেই বুযুর্গী নয়। এটা হিন্দুয়ানী প্রথা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তাই পরিচ্ছন্নতা ঈমানের

অঙ্গ। দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হওয়ার অর্থ অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা নয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ছিল উজ্জ্বল। সৌন্দর্যে তাঁর দেহের প্রতিটি অংশই ছিল অতুলনীয়। তাঁর দিকে যতই দেখা হত, ততই যেন তাঁর সৌন্দর্য আরো অধিক মাত্রায় প্রতিভাত হত। সৌন্দর্যের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য শুধু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ছিল।

মোহ্‌তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মুবারক আদর্শ নিয়ে আমাদেরকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের জীবনের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ্‌র কসম! আপনাদেরকে তাবলীগী জামাতের সদস্য করার জন্য আমি এখানে আসি নি। তাদের কাছ থেকে আমি না কোন বেতন পাই, না কোন আর্থিক সহযোগিতা পাই। কিংবা নতুন কোন মতবাদ বা আদর্শ প্রচার করার জন্যও এখানে আমার আগমন হয় নি। আমি তো কেবল আপনাদের সামনে আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর আদর্শের বিবরণ দিয়েছি। আমরা যাতে তাঁর আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হয়ে যাই এবং সেই আদর্শের বাণী নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ি—এই ছিল আমার বক্তব্য। এই দায়িত্ব আমাদের নারী-পুরুষ সকলেরই।

এই মেহনতের বদৌলতে বিগত ষাট-সত্তর বছরে গোটা দুনিয়ায় এমন ব্যাপকভাবে দ্বীনের আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছে যা সত্যই বিস্ময়কর। ছয়টি মহাদেশেই আমি সফর করেছি। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ পাক ছয় মহাদেশেই এ মেহনতের যে নূর ও আছর প্রকাশ করেছেন, তা দেখে অবাক হতে হয়। ভারতের এক নিভৃত পল্লীতে যে মেহনতের শুরু, এখন তা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত গোটা দুনিয়ায় বিস্তৃত।

কাজেই মোহ্‌তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা হিম্মত করুন এবং নিজের জীবনকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করুন। তাবলীগ জামাতের জন্য নয়, বরং দ্বীন শিখা ও প্রচারের জন্য জীবন থেকে এক চিল্লা বা চার মাস সময় বের করুন। আল্লাহ্ পাক সকলকে তওফীক দান করুন। আমীন।



সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور.

وقال النبى صلى الله عليه وسلم انكم لتموتون كما تنامون و تحيون كما تبعثون ثم انها الجنة ابدا او النار ابدا . او كما قال صلى الله عليه وسلم.

আল্লাহ্ পাকই একমাত্র স্রষ্টা

মোহ্‌তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! জগতে আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, যার সঠিক সংখ্যা শুধু মাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। সেই অগণিত ও অসংখ্য সৃষ্টির প্রতিটিরই একটি নিজস্ব আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং প্রতিটি সৃষ্টিরই স্থায়িত্বকাল হিসাবে একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান যাত ছাড়া যেখানে যত বস্তু রয়েছে, সবকিছুই সৃষ্টি। শুধু আল্লাহ্ পাকই স্রষ্টা আর সবকিছুই সৃষ্টি। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আর সকলেই তাঁর করুণার মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র মালিক, আর সকলে তাঁর অধীনস্থ। তিনিই একমাত্র দয়ালু, আর সকলে তাঁর দয়ার ভিখারী।

দুনিয়ায় আমরা যে মানুষরূপে জন্ম লাভ করেছি, তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায়। লৌহ পদার্থ যে কঠিন হয়েছে, তাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায়। আসমান যে উপরে স্থাপিত হয়েছে, সেক্ষেত্রেও আসমানের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। والسماء رفعها, আল্লাহ্ পাকই তাকে সেভাবে স্থাপন করেছেন। যমীন যে আমাদের পায়ের নীচে এমন সুন্দর ও সমতলরূপে স্থাপিত হয়েছে, যমীন নিজের ইচ্ছায় তা হতে পারে নি। والارض فرشنها, আল্লাহ্ পাকই তাকে স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই যে মনোরম ও সুউচ্চ পর্বত-শ্রেণী,

এগুলোও তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় স্থাপিত হতে পারে নি। والجبال ارسها আল্লাহ্ পাকই এই পর্বতশ্রেণীকে স্থাপন করেছেন। واخرجنا منها ماءها মাটির নীচে এই সুপেয় পানির ধারা, পর্বতশ্রেণী থেকে কল্লোলিত হয়ে বয়ে চলা নির্ঝরণী। তাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি। মাটির গভীর থেকে এই পানির ধারা আল্লাহ্ পাকই প্রবাহিত করছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যমীনের উপর পানিকে স্থীতি দান করেছি। পানি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি।' বৃষ্টি না দিয়ে আল্লাহ্ পাক অন্য উপায়েও পানি বর্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু পৃথিবীকে আল্লাহ্ পাক একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালনা করছেন। তাই وانا صببنا الماء صبا বৃষ্টি হয়। যমীনের ফাঁক-ফোকর গলে সেই পানি যমীনের অভ্যন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়। তারপর আল্লাহ্ পাক বলছেন—

وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ※

আমি ইচ্ছা করলেই যমীনের এই পানির ধারা বন্ধ করে দিতে পারি। এক ফোঁটা পানির জন্য তখন তোমরা হাহাকার করে মরবে। আমাকে বল তো, যদি আমি এই পানির ধারা একেবারে নিঃশেষ করে দেই, فمن يأتيكم بماء معين তাহলে কে আছে তোমাদেরকে পানি দেবার মত ?

জগত একান্ত আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের সামনে এই যে দৃশ্য-অদৃশ্য মহা জগত, তা আল্লাহ্ পাক একমাত্র নিজ ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেছেন। এর আকৃতি-প্রকৃতিও আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে যেমন এর আকৃতিকে স্ব-অবস্থায় রেখে জগতের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে পারেন, তেমনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে এর আকৃতি-প্রকৃতি সবই মিটিয়ে দিতে পারেন। আমরা বর্তমানে যে আকারে ও অবস্থায় আছি, এটাও আল্লাহ্ পাকের একটি কুদরতের প্রকাশ। আবার তাঁর অপর একটি কুদরতের কথা তিনি এভাবে প্রকাশ করছেন—

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ
اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ※

তোমাদের চোখ, কান, বুদ্ধি-বিবেচনা যদি আল্লাহ্ পাক নষ্ট করে দেন, তাহলে একমাত্র তিনি ছাড়া এই ক্ষমতাগুলো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবার মত আর কে আছে ? অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে, আমাদেরকে বর্তমান অবস্থা

থেকে ভিন্ন একটি অবস্থায়ও পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

আল্লাহ্ পাক তাঁর আরো একটি কুদরতের কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন—

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ※

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন এক জাতি সৃষ্টি করবো। অন্যত্র আমাদেরকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমাদের আকৃতিই আমি পরিবর্তন করে দিব। মানব-আকৃতি থেকে পরিবর্তন করে আমাদেরকে আল্লাহ্ পাক অন্য কোন প্রাণীর আকৃতি দান করতেও সক্ষম। মোটকথা আল্লাহ্ পাকের নিকট অসম্ভব বা দুঃসাধ্য বলে কিছু নেই। যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা, অতি অনায়াসে তা তিনি সমাধা করতে পারেন।

আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নেয়ামত

এই যে মহা বিশ্ব, বিশ্বের অসংখ্য বস্তু, তাদের আকৃতি, গুণাগুণ, স্থিতি বিনাশ, কোন কিছুতেই সামান্য শরিষার দানা পরিমাণ দখলও তাদের নিজেদের নেই। সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রকৃত ও একমাত্র স্রষ্টা।

এই মহাবিশ্বে লৌহ পদার্থের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ্ পাক এই লোহার বিশাল বিশাল খনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বাতাস ছিল না। আল্লাহ্ পাক পাঁচশত মাইল পুরো বাতাসের এক চাদর দিয়ে পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছেন। আমাদের পায়ের নীচের এই যে আদিগন্ত বিস্তৃত মাটি, একসময় তার একটি বালুকণাও ছিল না। আল্লাহ্ পাক এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। কোথাও এক ফোঁটা পানির অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ পাক সাত সমুদ্র সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না, আল্লাহ্ পাক আকাশকে মেঘে মেঘে ঢেকে দিয়েছেন। সুদূর আকাশে এই যে, মিটিমিটি তাঁরা, এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ পাক অসংখ্য-অগণিত তারকা দিয়ে আকাশকে সাজিয়ে দিয়েছেন। আগুণ ছিল না। আল্লাহ্ পাক তাও সৃষ্টি করেছেন। পশু-পাখী, গাছ-পালা, তরুলতা ; কিছুই ছিল না। অনস্তিত্ব থেকে আল্লাহ্ পাক সবকিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। ক্ষমতার এই অনন্যতা আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ পাক একটি মাত্র আদেশেই ফিরিশতাদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে এমন বিশালাকায় অনেক ফিরিশতাও রয়েছেন যে, তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে গোটা সাত সমুদ্রের পানি অনায়াসে এঁটে যাবে। এমন কি সেখান থেকে এক ফোঁটা পানিও গড়িয়ে নীচে পড়বে না। যে আল্লাহ্ একটি

মাত্র নির্দেশে এমন বিশালাকায় ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারেন, সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব যে কত বিশাল ও ব্যাপক হতে পারে, ভেবে তার কুল-কিনারা পাবার সাধ্য মানুষের কোথায়!

আল্লাহ্ পাক একবার হযরত মূসা (আ.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, এই আসমান ও যমীন যদি আমার নির্দেশের অনুগত না হত, তাহলে আমি এমন একটি প্রাণী ছেড়ে দিতাম, যে প্রাণী এই আসমান ও যমীন উভয়টিকে গিলে ফেলত। আর এই উভয়টি হত তার একটি লোকমার সমপরিমাণ। আপনারা গোটা পৃথিবীর আকৃতি এবং এই সুবিশাল আকাশের আয়তন সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন। তারপর এই আসমান ও যমীনকে যে প্রাণী মাত্র একটি লোকমা হিসাবে গিলে ফেলতে পারে সেই প্রাণীটির মুখ কত বড় হতে পারে, প্রাণীটিই বা কত বড় হতে পারে, এবং সর্বোপরি প্রাণীটি যেই চারণভূমিতে চড়ে বেড়ায় তাই বা কত বড়, সে সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন। এ সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের গায়েবী নেযাম। এই মহা বিশ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র বস্তু থেকে নিয়ে মহান আরশ পর্যন্ত সব কিছু এক আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি। যেই আল্লাহ্ পাক এত বড় স্রষ্টা, তাঁর বিশালতা ও কুদরত যে কত সর্বব্যাপী তা মানুষের চিন্তা-ক্ষমতারও অতীত।

আল্লাহ্ পাকের কুদরত

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে সৃষ্টি জগতে, সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের অধীন। কিছুই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। কাজেই যখন ইচ্ছা তিনি যে কারো ও যে কোন বস্তুর আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতে পারেন। হযরত মূসা (আ.)-এর হাত থেকে যখনই লাঠি পড়ে গেল, فاذا هى هية تسعى সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ফনা তুলে ফোঁস ফোঁস করে ছুটতে লাগলো। আল্লাহ্ পাক মুহূর্তের মধ্যে তার একটি সৃষ্টির আকৃতি ও প্রকৃতি সবই পরিবর্তন করে দিলেন। অপর একটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক বস্তুর আকৃতি তার স্বঅবস্থায় বহাল রেখে শুধু প্রকৃতি পরিবর্তন করেও দেখিয়ে দিয়েছেন— قلنا يا نار كونى بردا و سلاما ওহে অগ্নিকুণ্ড! তুমি আরামপ্রদ শীতল হয়ে যাও। আগুন আগুনের নিজ রূপেই লেলিহান হয়ে রইল। শুধু তার চরিত্র পরিবর্তন হয়ে শীতল হয়ে গেল। হযরত ইউনুস (আ.)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক মৃত্যুর সকল উপকরণ সৃষ্টি করে সেগুলো থেকে মারণ-শক্তি দূর করে দিয়ে তার মধ্যেই হযরত ইউনুস (আ.)-কে জীবিত রাখলেন। উত্তাল সমুদ্রবক্ষে এক বৃহদাকৃতির মাছ তাঁকে গিলে ফেললো। মৃত্যুর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। কিন্তু আল্লাহ্ পাক সেই আলো-বায়ুহীন মৎসগর্ভেই তাঁর জীবন সচল রেখেছেন।

প্রকৃত মালিক

উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা আল্লাহ্ পাক এই বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতের প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিক হলেন আল্লাহ্ পাক। তাঁর ইচ্ছাতেই গোটা সৃষ্টি জগত চলছে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো পক্ষেই এ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن আল্লাহ্ পাকের যা ইচ্ছা তাই হয়, আর যা ইচ্ছা নয়, তা কিছুতেই হয় না। তার যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন—কাউকে কন্যা দান করেন। কাউকে পুত্র দান করেন। কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন। আর কাউকে একেবারে নিঃসন্তানই রেখে দেন। এটা একান্তই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা।

মোটকথা, এই মহা বিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। গোটা বিশ্বের কোন একটি বস্তুও এমন নেই, যা আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং এই বিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তুর একমাত্র মালিকও আল্লাহ্ পাক। সকল বস্তুকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। বস্তুসমূহের এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে, নিজে নিজে নয়।

পানির কলকল-ছলছল প্রবাহ,
পাহাড়ের অনড় স্থিতি,
বাতাসের কোমলতা,
সূর্যের প্রখরতা,
চাঁদের স্নিগ্ধতা,
তারকার মিটিমিটি জ্বলে থাকা,
রাতের আঁধার, আর
দিনের উজ্জ্বলতা,
শস্যক্ষেতের শ্যামলতা,

ফুলের সুবাস ও ফলের স্বাদ, বুলবুলির কণ্ঠে অনাবিল সুর-মুর্ছনা, আর মানুষের মাঝে অসংখ্য গুণের সমাবেশ—এর কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি। এর পিছনে রয়েছে এক মহা শক্তির কুদরতী হাত। এক কুশলী স্রষ্টার অতুলনীয় শিল্প। মোটকথা, এ জগতে যা হয়, তার সবই রাব্বুল আলামীনের ইশারায় হয়।

আল্লাহ্ পাকের কোন শরীক নেই

এ নিখিল বিশ্বের একক স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের কোন অংশীদার বা শরীক নেই। এ বিষয়ে কালামে পাকে বর্ণিত কিছু আয়াত আমি আপনাদের

সামনে উপস্থাপন করছি—

والهكم اله واحد . لا اله الا هو الرحمن الرحيم . الله لا اله الا هو . رب المشرق والمغرب لا اله الا هو . فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو .

তোমাদের মাবুদ একজন। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা নিখিল বিশ্বের রব। তিনি একা। তারা যদি আপনাকে ত্যাগ করে যায়, আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই। কোন উযীর নেই, পরামর্শদাতা নেই। স্ত্রী-সন্তান নেই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি কোন রবও নেই। বরং وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله আসমান ও যমীনে তাঁর একাধিপত্ব ও একক রাজত্ব। পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সকল বস্তুই আল্লাহ্ পাকের— له ما فى السموات وما فى الارض وما بين هما। গোটা সৃষ্টি জগতে নিজের রাজত্ব ও মালিকানা প্রমাণের পর তা পরিচালনা-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে বলেছেন—

وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى .

তোমরা জোড়ে বা আস্তে যেভাবেই বল না কেন, আল্লাহ্ পাক সবই শোনতে পান। —*সূরা ত্ব-হা - ৭*

'আস্তে' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মনে মনে চিন্তা করা। আমি যে 'ইয়া আল্লাহ্!' বলছি, যত আস্তেই তা উচ্চারণ করি, আল্লাহ্ পাক তা শোনতে পাচ্ছেন। এখন মুখ বন্ধ করে, ঠোঁট বন্ধ করে মনে মনেও যে 'ইয়া আল্লাহ্' বললাম, আমি নিজেও তা শোনতে পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমি তাও স্পষ্ট শোনতে পেয়েছি। যিনি এমন গুণের অধিকারী তিনিই কেবল হতে পারেন গোটা সৃষ্টি জগতের একক মালিক—

الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى , اننى انا الله لا اله الا انا, هو الله الذى لا اله الا هو , عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم , هو الله الذى لا اله الا هو , قل هو الله احد .

উপরোক্ত আয়াতগুলোর সারমর্ম হল, গোটা সৃষ্টি জগতে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর। কোন কাজ করার জন্য তাঁকে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় না। তাঁর ইচ্ছার কোন অংশীদার নেই। তাঁর চেয়ে বড়, তাঁর চেয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড কেউ নেই। একমাত্র তিনিই শক্তিশালী, আর সকলে শক্তিহীন। তিনিই রাজাধিরাজ, আর সকলে তাঁর প্রজা। তিনিই সকলকে সাহায্য করেন, আর কারো সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তিনি সকলকে রক্ষা করেন, আর কারো রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। তিনি সকলকে প্রতিপালন করেন, আর সকলে প্রতিপালিত। এই প্রতিপালনের জন্য তাঁকে কারো নিকট সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। বরং انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون শুধু 'কুন্' বলাতেই সব হয়ে যায়। 'কুন্ বলা' দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, আল্লাহ্ পাক দিন রাত শুধু 'কুন্ কুন্' বলে চলেছেন। এটা শুধু আমাদেরকে বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল—আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাক নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই যাকে পরওয়া করতে হবে বা তার কাছে কিছুর আশা করতে হবে। তাঁর ইচ্ছার পথে এমন কোন বাঁধা দানকারীও নেই, যাকে ঘুস দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হবে বা তার কাছে কারো সুপারিশ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। বরং وهو معكم اين ما كنتم তিনি এমন সর্বব্যাপী সত্ত্বা যে, তোমরা যেখানেই থাক, এবং যে অবস্থাতেই থাক, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। চাই রাতের অন্ধকারেই চল বা দিনের আলোতেই চল। চাই সমুদ্র-পিঠে বা সমতলের বুকে চল। পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় বা সুবিশাল আকাশের যে প্রান্তে গিয়েই লুকিয়ে থাক না কেন, আল্লাহ্ পাক সর্বক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আছেন। انها ان تك مثقال حبة من خردل সরিষা পরিমাণ পাপ বা পূণ্য যাই করো না কেন, তা যদি কোন অন্ধকার গুহায় বা সুবিশাল আকাশের কোন এক সুদূর প্রান্তে অথবা যীমনের গভীরেও লুকিয়ে থাকে, আল্লাহ্ পাক সেখান থেকে তা বের করে এনে তোমাকে দেখাবেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

আল্লাহ্ পাক তাঁর ইচ্ছার ক্ষেত্রে কোন ফিরিশ্তা, মানব-দানব, নবী-রসূল বা আগুন-পানি-মাটি, কিছুরই মুহ্তাজ নন। নিজের রাজত্ব পরিচালনার জন্যও আরশ-ফরশ বা আসমান-যমীনের মুখাপেক্ষী নন। নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য

তাঁর ফিরিশ্তাকুল বা মানবজাতিরও প্রয়োজন নেই। নিজের কুদরত প্রকাশের জন্য রাত্র-দিনের এই সুশৃংখল পালাবদলের আবশ্যক নেই। আমাদের সজদা আর ফিরিশ্তাদের ইবাদত না হলেও তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি এমন মহান এক অস্তিত্ব ....

যাঁর কোন শুরু নেই, শেষও নেই।
যাঁর কোন আরম্ভও নেই, অন্তও নেই।
যিনি সকলকে আকৃতি দান করেছেন, কিন্তু নিজে নিরাকার।
সকলকে রঙে-বর্ণে বর্ণিল করে তোলেছেন, কিন্তু তিনি বর্ণহীন।
সকলের আহার্যের যোগান দেন, কিন্তু তাঁর আহারের প্রয়োজন নেই।
সকলকে নিদ্রা দান করেন, কিন্তু তাঁর নিদ্রা নেই।
সকলকে মৃত্যু দান করেন, কিন্তু নিজে মৃত্যু থেকে পবিত্র।
সব কিছু বিনাশ করেন, কিন্তু নিজে অবিনাশী।
আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন—

ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين .

আমার বান্দারা! তোমরা কি আমার পরিচয় জান ? আমি তোমাদের রব। আমি মাত্র ছয় দিনে গোটা আসমান-যমীনকে স্থাপন করেছি। তারপর আরশের উপর নিজে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছি। রাত দিনের নেযাম চালু করে একটিকে অন্যটির অনুগামী করেছি। এই চন্দ্র-সূর্য ও তারাকারাজিকে নিজের গোলাম বানিয়েছি। মন দিয়ে শোন ...

সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই এবং হুকুমতও একমাত্র তাঁর।
একথাটিই আল্লাহ্র নবী নিজের ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন—

الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده ....

রাতও আল্লাহ্র, দিনও আল্লাহ্র। রাত-দিনের সমস্ত মাখলুকও আল্লাহ্র। সৃষ্টি আল্লাহ্র, হুকুমতও আল্লাহ্র। এই রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই। এ

বিষয়ে তাঁর কোন শরীক নেই। অর্থাৎ, এই হুকুমত ও রাজত্বের ক্ষেত্রে তিনি কারো সঙ্গে পার্টনারশীপ করছেন না। দুই ভাই যেমন পিতার সম্পদে পরস্পরের শরীক, আল্লাহ্ পাকের তেমন কোন শরীক নেই। সে ঘোষণা দিয়েই তিনি বলেন— لم يلد তাঁর কোন পূর্বসুরি নেই। ফলে বাপ-দাদা ও ভাই-বেরাদরের বন্ধন থেকে তিনি পবিত্র। لم يولد তাঁর কোন উত্তরসূরিও নেই। ফলে ছেলে-সন্তান থেকেও তিনি পবিত্র। পূর্ব থেকে চলে আসা অংশিদার হল শরীক। আর 'মুশারিক' বলা হয়—প্রথমে একাই ছিল। পরে বিষয়-সম্পদ ও ব্যবসা-বানিজ্যের প্রশার হওয়ায় যখন সবকিছু একা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ তার কোন বিশ্বস্ত ভাই, বন্ধু ও নিকটাত্মীয় কাউকে ব্যবসা-বানিজ্য ও বিষয়-সম্পদ সামাল দিবার কাজে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করে। মোটকথা, পৈত্রিক বিষয়-সম্পদের অংশিদারকে বলা হয় শরীক। আর যাকে কাজে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সে হল মুশারেক।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন—আমার এমন কোন মুশারিকও নেই যে, আমি আমার কার্য পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছি, এই আসমান ও যমীন রক্ষণাবেক্ষণ আমার একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, ফলে কোন সহযোগী গ্রহণ করেছি। আর না এমন কোন শরীক আছে, যে শুরু থেকেই আমার রাজত্বের অংশীদার হিসাবে রয়েছে। বরং আমার অস্তিত্ব, আমার গুনাবলী ও আমার ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমি একক। যাহোক, আল্লাহ্ পাক বলেছেন—

ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن .

আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, তিনি যা চান না, তা কিছুতেই হয় না। কিন্তু আজ আমাদের চেতনার এমন বিপর্যয় ঘটেছে যে, আমরা ভাবছি টাকা দিয়েই সবকিছু হয়। আজ মানুষ পাথরের মূর্তি পূঁজা করে না ঠিক, সজদা করতে কবরের কাছেও যায় না তাও অনেকাংশে সত্য। মানুষ যেন একেবারে খাঁটি ঈমানদার হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ মু'মিনের শান এমনই হওয়াই উচিত ছিল যে, তার কপাল আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে সজদায় অবনত হবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলো পাথরের মূর্তির স্থানে আজ অন্য এক মূর্তি মানুষের মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই মূর্তিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হয়ত সজদা করে না, কিন্তু অন্তর তার সামনে এক বিরামহীন সজদায় নত হয়ে আছে। সেই মূর্তিটি হল অর্থ-সম্পদ। আজ আমাদের বিশ্বাস হল, টাকা দিয়েই সব কিছু হয়। টাকা নেই তো কিছুই নেই। টাকা থাকলে সম্মান আছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব আছে। টাকা না থাকলে কেউ জিজ্ঞাসা করতেও আসে না। আত্মীয়তা, বন্ধু-ভালবাসা

কিছুই থাকে না। টাকাই হল আজকের এক অদৃশ্য মূর্তি। যে মূর্তির সজদায় আমাদের হৃদয় সতত নত হয়ে আছে।

টাকা আজ আমাদের গোটা হৃদয় আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে নানাভাবে আমাদেরকে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাকই সব কিছুর উৎস। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার পথে কোন রাজার রাজত্ব, অর্থের সঙ্কট বা অন্য কোন বিষয়ই বাঁধা হতে পারে না। একথা সত্য যে, দুনিয়া 'দারুল আস্‌বাব'। বাহ্যত দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ই বস্তুনির্ভর। চর্মচোখে দেখা যায় যে, টাকা দিয়ে কার্য উদ্ধার হয়। ঔষধ দিয়ে রোগ ভাল হয়। বেঁচে থাকার জন্য আহার্যের প্রয়োজন হয়। ব্যবসা ও চাষবাসের প্রয়োজন হয়। তবে, মনের বিশ্বাসও বস্তুনির্ভর হয়ে পড়া, বস্তুর সহযোগিতা ছাড়া কিছু না হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়তা লাভ করা এমন একটি ভুল, যাতে শিরকের জীবানু লুকিয়ে রয়েছে।

মানুষের দেহে টি.বি.-জীবানুর অস্তিত্ব যেমন তাকে যে কোন মুহূর্তে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়, তেমনি 'টাকা ছাড়া কিছু হয় না' —মনের এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে শিরকের জীবানু লালন করারই নামান্তর। এই জীবানু সক্রিয় হয়ে ওঠলেই গোটা অস্তিত্বকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলবে, সন্দেহ নেই। মোটকথা, আজ মানুষের মনের কেবলা আর আল্লাহ্ পাকের মহান যাত নয়। সে স্থানটি এখন দখল করে নিয়েছে অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসা-বানিজ্য।

নামাযের অমনোযোগিতা

আজকাল আমাদের অবস্থা হল, মসজিদে গিয়ে 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে নামাযে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরই দেখা যায়, মন আর নামাযে নেই। এতে বুঝা যায় যে, আমাদের মনের কেবলা আল্লাহ্ পাক নয়। অথচ বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে, তখন আরশের সমস্ত দরজা খুলে যায়। যখন সে الحمد لله رب العالمين বলে, তখন আল্লাহ্ পাক বান্দার প্রতি মনোযোগী হয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপ আরম্ভ করেন। অথচ বান্দা তখন তার দোকান-মকান আর ব্যবসা-বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার অস্তিত্বের মূল অংশ আত্মাকে দোকান-মকানে পাঠিয়ে দিয়ে শুধু পেশাব-পায়খানায় পূর্ণ তার দেহটি কিছু নাপাকির বোঝা নিয়ে মস্‌জিদে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে প্রমাণ হয় যে, তার অন্তর আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও অপরিচিত। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে মানুষের অন্তরের এই অপরিচয়ের কারণ হল, অর্থ-নির্ভর মানসিকতা। দুনিয়ার ইয্‌যত-

সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু টাকায় অর্জিত হয়—এই চেতনায় মনের আচ্ছন্নতা।

অপরদিকে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন—হে আমার বান্দারা! আল্লাহ্ই সব কিছু। তিনি কোন 'সবব' বা উপকরণের মোহ্‌তাজ নন। সেই ঘটনাটি কি তোমাদের জানা নেই?—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ইবরাহীম (আ.)-কে তাতে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়েছে। একদিকে পানির ফিরিশ্‌তা দাঁড়িয়ে আছেন, একদিকে হযরত জিবরায়ীল (আ.) দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝখানে হযরত খলীলুল্লাহ্ আগুনের কুণ্ডলির মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন। পানির ফিরিশ্‌তা অস্থির হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য প্রার্থনার অপেক্ষা করছেন। তিনি সাহায্য চাইলেই পানি ছিটিয়ে গোটা আগুনের কুণ্ডলি নিভিয়ে দিবেন। হযরত জিবরায়ীল (আ.)-ও তার সাহায্য প্রার্থনার অপেক্ষা করছেন। সাহায্য চাইলেই তিনি তাকে উঠিয়ে আগুন থেকে সরিয়ে দিবেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) ঈমানের এমন এক স্তরে ছিলেন, যেখান থেকে হযরত জিবরায়ীল (আ.)-এর বিশাল অস্তিত্বকেও নিতান্ত একজন মাখলুক ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল যে, একজন মাখলুক দ্বারা কিছুই হতে পারে না। যা করার একমাত্র আল্লাহ্ পাকই করেন। তাই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার মুহূর্তেও তিনি হযরত জিবরায়ীল (আ.)-এর নিকট সাহায্যের কোন আবেদন জানালেন না। বরং তিনি বললেন, حسبى الله ونعم الوكيل আল্লাহ্ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। ফলে আল্লাহ্ পাক এই 'আসবাবের দুনিয়ায়' এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন এবং সেই ঘটনাটি কোরআন মজীদে উল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন—হে আমার বান্দারা! তোমরা অর্থ-সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের গোলামী থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহ্‌র গোলামী গ্রহণ কর। তোমরা এমন 'তাওহীদ' অর্জন কর যে, যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের হৃদয়ে যেন আমি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব না থাকে। যদি নামাযে তোমাদের হৃদয়ে আমি ছাড়া আর কারো উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে, তাহলে মনে করবে, সে তাওহীদ নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল নয়। এ তাওহীদ তোমাদেরকে চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেবার সামর্থ্য রাখে না।

নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)

নামাযের মধ্যেই যে ব্যক্তির আল্লাহ্ পাকের কথা মনে থাকে না, সে ব্যক্তি দোকানে বসে আল্লাহ্‌র স্মরণে বিভোর হয়ে থাকবে, একথা কি বিশ্বাস করা যায়? আর যে ব্যক্তি নামাযই পড়ে না, তার সম্পর্কে কী বলা যায়?

যা হোক, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বললেন حسبى الله ونعم الوكيل আমার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট, তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর গায়েবী নেযাম চালু করে দিলেন। আগুন যথারীতি জ্বলতে থাকলো এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও অগ্নিকুণ্ড থেকে বের করে আনা হল না। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলেই এক ধাক্কায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনের ওপারে নিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সে ধরনের কিছুই করা হল না। বরং তাঁকে যখন আগুনের উপর ছুড়ে দেয়া হল, আল্লাহ্ পাক তাঁকে অগ্নিকুণ্ডের ঠিক মাঝখানেই ফেললেন। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আগুনকে একথাও বলে দিলেন—يا نار كونى بردا و سلاما ইবরাহীমের জন্য আরামদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও। আল্লাহ্ পাক যখন بردا বললেন, আগুন এমন শীতল ওয়ে উঠলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক বললেন, سلاما আরামপ্রদ। মা যেমন তার শীতকাতর সন্তানকে গরম পোশাকে আবৃত করে দেয়, আগুন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তেমনি আরামপ্রদভাবে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নিয়ে বসিয়ে দিল। দূর থেকে অপেক্ষমান লোকজন দেখতে পেল, বস্ত্রহীন হযরত ইবরাহীম (আ.) সুন্দর বস্ত্রে আবৃত হয়ে বেশ খোশ মেজাজেই বসে আছেন।

কাণ্ড দেখে দর্শকদের একজন বলে ওঠলো—

نعم الرب ربك يا ابراهيم.

ইবরাহীম! তোমার রব তো ভারী জবরদস্ত!

ঈমান না এনেও লোকটি আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতার অকুণ্ঠ স্বীকার করলো।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও আল্লাহ্ পাকের কুদরত

হযরত মারইয়াম (আ.) গোসল করার জন্য একদিন কুপের পারে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর হঠাৎ তাঁর সামনে এক ফিরিশ্তা এসে উদয় হলেন। হযরত মারইয়াম (আ.) চমকিত হয়ে বলে ওঠলেন— اعوذ بالرحمن আল্লাহ্ রক্ষা করুন! তুমি কে? ফিরিশ্তা বললেন, ঘাবরাবার কিছু নেই। انما انا رسول ربك আমি একজন ফিরিশ্তা। হযরত মারইয়াম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে কি জন্য এসেছো ? জবাবে ফিরিশ্তা বললেন— لاهب لك غلاما ذكيا আল্লাহ্ পাক আপনাকে একজন সন্তান দেবার ইচ্ছা করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই আমার আগমন। হযরত মারইয়াম (আ.) আরো অধিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—- كيف يكون لى غلام আমি একজন অবিবাহিতা কুমারী নারী। আমার সন্তান হবে কিভাবে?

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ ঘটনা শোনাবার রহস্য কি? তিনি কি কোন গল্পকার ? শুধু গল্প শোনাবার উদ্দেশ্যেই কি তিনি ঘটনা বলেন? অবশ্যই নয়। কোরআনে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই একটি অতীব সত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে। একটি বাস্তবতার বিশ্বাস আল্লাহ্ পাক মানুষের মনে দৃঢ়মূল করে দিতে চান। আর তা হল—আল্লাহ্ পাক বলতে চান—আমার বান্দারা! তোমরা আমার বস্তুর গোলাম হয়ে যেয়ো না, বরং আমার গোলামী গ্রহণ কর। কোন বস্তুই আমার ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে পারে না। আমার যখন যেমন ইচ্ছা, বস্তুকে আমি তখন তেমন করি। কাজেই বস্তু ও আমার হুকুম কখনো বিপরীত অবস্থানে দাঁড়ালে বস্তু ত্যাগ করে আমার হুকুমকেই গ্রহণ করবে। আমার হুকুম পালন করতে গিয়ে যদি জীবনও দিতে হয়, তাতেও দ্বিধা করবে না। কোরআনে উদ্ধৃত ঘটনাবলী দিয়ে আল্লাহ্ পাক মানুষকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। একারণেই একই ঘটনাকে একাধিকবার তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন।

যাহোক, হযরত মারইয়াম (আ.) ফিরিশ্তার কথার জবাবে বললেন, সন্তান হবার যে বৈধ উপায় রয়েছে, কারো সঙ্গে সেই বৈবাহিক সম্পর্কই তো আমার হয় নি। ولم اك بغيا তাছাড়া আমি চরিত্রহীনাও নই যে, অবৈধ উপায়ে আমার সন্তান হবে। কাজেই আমার সন্তান হওয়া কিভাবে সম্ভব ? ফিরিশ্তা বললেন, এমনিতেই হয়ে যাবে। আল্লাহ্ পাকের জন্য এটা মোটেও কঠিন কিছু নয়। ফিরিশ্তা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর দিকে অগ্রসর হলে তিনি আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠলেন। তারপর আগুয়ান ফিরিশতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁর আস্তিনটি ধরে তাতে ফুঁক দিলেন। তার এক ফুৎকারেই হযরত মারইয়াম (আ.) নয় মাসের গর্ভবতী হয়ে পড়লেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ذلكم الله ربكم الحق এই হলেন তোমাদের সত্য রব। তিনি যা চান তাই করে দেখান। আর তিনি যা করবেন না বলে স্থির করেন, তা কারো পক্ষেই করা সম্ভব হবে না। তিনি যা বন্ধ রাখবেন, তা কারো পক্ষেই সচল করা সম্ভব নয়। তিনি যা দিবেন, তাও কেউ রুখতে পারবে না। আর যা তিনি ছিনিয়ে নেন, কেউ তা দিতেও পারবে না। তিনি সবার উপরে ও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর গোলামী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

الا وان الكتاب والسلطان ليفترقان فلا تفارق الكتاب .

শোনে রাখ! এমন একটি সময় আসবে, যখন রাজত্ব ও আমার দ্বীন দুটি ভিন্ন পথে চলবে। খবরদার! রাজত্বের চক্রে পড়ে তোমরা আমার দ্বীন ত্যাগ করো না। পার্থিব স্থুল বস্তুর অনুগামী হয়ে আখেরাতকে বরবাদ করো না। দুনিয়ার গোলাম হয়ে যেয়ো না। বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করো। তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে যে, তার অনুগমন করলে সে তোমাদেরকে গোমরাহ্ করে দিবে। আর তার অনুগমন থেকে বিরত থাকলে তোমাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো ? নবীজী বললেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর ঐ সঙ্গীদের মত ধৈর্য ধারণ করবে, যাদেরকে শুলিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল। ঐ রবের কসম যার হাতে মোহাম্মদের জীবন!...

لميتة فى اطاعت الله خير من حيات فى معصية الخالق ❋

আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারী করে মরে যাওয়া, তাঁর নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক উত্তম।

কাজেই বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র চাহিদা হল, মানুষ যেন তাঁদের গোলাম ও অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে, এবং দুনিয়ার স্থুল বস্তু, সহায়-সম্পদ, ক্ষমতা ও রাজত্ব, আত্মীয়-স্বজন এবং নফ্স-শয়তানের আনুগত্য করে নিজের এই অমূল্য জীবনকে যেন বরবাদ না করে। আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। মানুষের সকল কর্মই তাঁর নখদর্পনে। মানুষের যাবতীয় কর্মের হিসাব গ্রহণ করার জন্য তিনি একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন—

ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا ❋

و فتحت السماء فكانت ابوابا ❋

নিশ্চয় বিচার-দিবস নির্ধারিত রয়েছে। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে। —*সূরা নাবা - ১৭-১৯*

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি মোটেও উদ্দেশ্যহীন নয়। যার যেমন ইচ্ছা তেমনই জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্ পাক এ উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন নি। বরং মানব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে মহান রাব্বুল আলামীনের গভীর এক উদ্দেশ্য। মানুষের দ্বারা সে উদ্দেশ্য যথার্থরূপে পুরণ হলো কি না, সে হিসাব গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ পাক একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে দিনটি শুরু হবে এ যমীন ও আসমানকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে। اذا زلزلت الارض زلزا لها (যমীন যেদিন ভীষণরূপে প্রকম্পিত হবে), এটা হবে পৃথিবীর মৃত্যু। اذا السماء انفطرت (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে), এটা হবে আকাশের মৃত্যু। اذا الكواكب انتثرت (যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে), এটা হবে তারকাপুঞ্জের মৃত্যু। واذا الشمس كورت (যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে), এটা হবে সূর্যের মৃত্যু। اذا الجبال سيرت (যখন পবর্তমালা অপসারিত হবে), এটা হবে পাহাড়ের মৃত্যু। اذا البحار سجرت (যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে), এটা হবে সমুদ্রের মৃত্যু। منها خلقنكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى (এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে আমি পুনঃর্বার সেদিন উত্থিত করবো), এটা হল গোটা মানব সমাজের মৃত্যু। মোটকথা, গোটা সৃষ্টি জগতই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

এ দিনটির বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ পাক কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন— 'সেদিন গোটা পৃথিবী ও পর্বমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।' (সূরা হাক্কাহ্-১৪) যেদিন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (সূরা ফাজর-২১) বস্তুতঃ এটা হবে এক বিকট শব্দ। (সূরা ইয়াসীন-২১) যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে কঠিন দিন। কাফেরদের জন্য এটা সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির-৮-১০)। সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফিরিশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফোরকান-২৯)। সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফিরিশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফিরিশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (সূরা হাক্কাহ্-১৫-১৮)।

আল্লাহ্ পাক এভাবে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। দুনিয়াতে তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন— যার যেমন ইচ্ছা করুন, এখানে কারো কোন কর্ম সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে না। কখনো কখনো হয়তো সামান্য ঝাঁকি দিয়ে সতর্ক করে দেন, কিন্তু আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন না কিছুই। জিজ্ঞাসা করার জন্য তিনি একটি দিন

নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সেদিনটি অবশ্যম্ভাবীরূপেই একদিন এসে উপস্থিত হবে। সেদিনটি কবে কখন এসে উপস্থিত হবে ? এ সম্পর্কে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

فيم أنت من ذكراها, إلى ربك منتهاها, إنما أنت منذر من يخشاها,

كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها .

হে আমার মাহ্‌বুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেয়ামত দিবসের বিবরণ দেয়া তো আপনার কাজ নয়। এ সম্পর্কিত জ্ঞান শুধুমাত্র আপনার রবের কাছেই রয়েছে। আপনি শুধু মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে যান। যেদিন তারা সেই দিবসটি দেখতে পাবে, সেদিন বলবে, আমরা তো পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করেছি। —*সূরা নাযি'আত - ৪৩-৪৬*

বিচার দিবস

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের বিচারের জন্য আল্লাহ্ পাক একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেদিন গোটা সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করে দিবেন। তারপর পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এবং মানুষকে পুনরোত্থিত করে তাদের ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান দিবেন। وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه, প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাদের ঘাড়ের উপর ঝুলে থাকবে। সেদিন এক দল জান্নাতে যাবে আর এক দল যাবে জাহান্নামে। কবর থেকে বেরিয়ে আসার সময় কিছু লোক বলবে—হায়! কবর থেকে আমাদেরকে কে উঠালো? তাদের উত্তরে আরেক দল বলবে—এটা সেই দিন, যার কথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। কিছু লোক সেদিন কবর থেকে বেরিয়ে এসে মাথার উপর ভর করে হাশরের ময়দানের দিকে চলতে থাকবে।

হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আরয করলেন, মাথার উপর ভর করে মানুষ কিভাবে চলবে ? জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে রব পায়ের উপর ভর করে চলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তাকে মাথার উপর ভর করে চলার শক্তি জোগাবেন। সেদিন মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানের উদ্দেশ্যে চলতে থাকবে। এক দল চলবে সওয়ারীতে

আরোহন করে। এক দল চলবে পায়ে হেঁটে। আর এক দল চলবে মাথার উপর ভর করে।

সেদিন কবর থেকে বেরিয়ে আসা কিছু লোকের চেহারা থাকবে হাস্যোজ্জ্বল, ঝলমলে—وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (সূরা গাশিয়া)। আর কিছু মুখমণ্ডল আপনি দেখতে পাবেন خاشعة عاملة ناصبة লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত। (সূরা গাশিয়া)। تعرف في وجوههم نضرة النعيم কিছু মুখমণ্ডলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (সূরা তাতফীফ)। ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলোয় ধূসরিত ও কালিমাচ্ছন্ন। চোখ নিস্প্রভ, বিবর্ণ দেহবর্ণ। তাদের শরীর থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে। (সূরা আবাসা)।

কিছু মানুষকে দলবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন—

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا * ونسوق المجرمين إلى

جهنم وردا *

সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করা হবে। আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।—*সূরা মারইয়াম ৮৫-৮৬*

গ্রীষ্মকালে কুকুর যেমন জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, তেমনি কিছু লোকের জিহ্বা বেড়িয়ে নাভী পর্যন্ত ঝুলে থাকবে এবং তারা প্রচণ্ড পিপাসায় হাঁপাতে থাকবে। এই ভয়াবহ অবস্থায় তাদেরকে কবর থেকে ওঠানো হবে।

কেউ বাঁ হাতে আমলনামা পাবে। তখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বুকফাঁটা আর্তনাদ করে বলতে থাকবে— يليتني لم اوت كتابية হায়! যদি এই আমলনামা আমার হাতে না আসত। ولم ادر ما حسابية আমি তো জানতামই না যে, একদিন আমাকে এমন ভয়াবহ হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। এই মৃত্যুই যদি আমাকে শেষ করে দিত। কেন পুনরায় আমার উত্থান হলো! আমার ধন-সম্পদ আজ আমার কোন কাজে আসলো না! আমার রাজত্বও আমার কোন কাজে আসল না!

আর কিছু লোক তাদের আমলনামা পাবে ডান হাতে। তারা আনন্দে চিৎকার করে বলতে থাকবে— هاؤمقرؤ كتابية ওহে! তোমরা সকলে এসে

আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমার সাফল্যের সনদ দেখে যাও। এই হিসাব-দিনের বিশ্বাস আমার ছিল, এবং সেজন্য আমি প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে— فهو في عيشة راضية ، في جنة عالية আমার এই বান্দারা সুউচ্চ জান্নাতে সুখী জীবন যাপন করতে থাকবে। সে জান্নাতে গাছে গাছে পরিপক্ক ফলফলাদি ঝুলে থাকবে, এবং আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণই সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। বিগত দিনে আমাকে রাজি-খুশী করার জন্য তোমরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছ, তার প্রতিদানে আজ তোমরা যত ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তৃপ্তি মিটিয়ে পানাহার ও আনন্দ করতে থাক। আল্লাহ্ পাক বলেন— يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا তাদেরকে স্বর্ণের অলংকার ও সবুজ রেশমের পোশাক আল্লাহ্ পাক নিজ হাতে পড়িয়ে দিবেন, এবং تعرف في وجوههم نضرة النعيم আল্লাহ্ পাক তাদের চেহারায় নিজের নূরের ঔজ্জ্বল্য মেখে এমন চমকদার করে দিবেন যে, আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদের চুলগুলো সুবিন্যস্ত করে দিবেন। আর নারীদের সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ সৌন্দর্য্যের অপার বিন্যাসে সাজিয়ে দিবেন। তাদের সেই কেশগুচ্ছ হতে কয়েক গাছি চুল এনে যদি দুনিয়ায় রাখা হয়, তাহলে গোটা দুনিয়া আলোয় আলোয় ভরে ওঠবে ও সুগন্ধে মৌ মৌ করতে থাকবে।

তারপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শত জোড়া জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন। মাথায় পড়িয়ে দিবেন নূরের মুকুট। তারপর বলবেন, যাও, তোমাদের পরিবারের লোকজনদের কাছে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠো। ফলে তারা আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে কামিয়াবীর সনদ নিয়ে আনন্দচিত্তে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে। তখন সকলেরই দৈহিক উচ্চতা হবে হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় ১২৫ ফিট। সৌন্দর্য হবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায়। হৃদয়ের প্রশারতা হবে হযরত আউয়ূব (আ.)-এর ন্যায়। কণ্ঠের মধুরতা হবে হযরত দাউদ (আ.)-এর ন্যায়। বয়সে থাকবে হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় ৩৩ বছরের উদ্দামতা। সর্বোপরি চরিত্র-মাধুর্যে সকলেই হবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় অনাবিল। এরা হল জান্নাতের অভিযাত্রী। আর এক দল হবে জাহান্নামী।

যারা জাহান্নামে যাবে তারা পরস্পরকে গালাগালি করতে থাকবে। আর জান্নাতগামীরা একে অন্যকে 'সালাম, সালাম' বলতে বলতে চলতে থাকবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন বাহনের ব্যবস্থা থাকবে। জাহান্নামীরা জাহান্নামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর রক্ষী

ফিরিশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে—

الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و
ينذرونكم لقاء يومكم هذا ❋

তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসে নি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে, হাঁ, এসে তো ছিলেন ঠিক। কিন্তু আমরা তাদের কথা মানি নি। তাদেরকে অস্বীকার করে আমরা শয়তানের অনুসরণ করেছি।

জাহান্নাম এমন এক কঠিন শাস্তির স্থান যেখানে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে আর বের হয়ে আসার কোন উপায় নেই। তবে তাতে এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে গুনাহ্গার মুসলমানরা তাদের নিজ নিজ অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর সেখান থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসবে। জাহান্নামীদের জন্য সেখানে আগুনের বড় বড় খাঁচা তৈরী করা হবে। সেই খাঁচায় তাদেরকে বন্দী করে দেয়া হবে। জাহান্নামীদের দৈহিক আকৃতি এমন বিশাল করে দেয়া হবে যে, তাদের একেকটি দাঁতের আকার হবে ওহোদ পাহাড়ের সমান বৃহৎ। মদীনার ওহোদ পাহাড়টি প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ। সেই খাঁচার সঙ্গে জাহান্নামীদের দেহের প্রতিটি রগ ফিরিশতারা আগুনের পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়ে খাঁচার ফাঁকফোকরগুলো আগুনের কয়লা দিয়ে ভরে দিবেন। তারপর সেই খাঁচা বন্ধ করে দিয়ে তাতে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের গহীন গভীরে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। এ বিষয়টিই কোরআন এভাবে প্রকাশ করেছে—

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل .

তাদের জন্য উপর ও নীচ থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে।

হাশরে মানুষের দু'টি দল

মোটকথা, হাশর মানুষকে দু'টি দলে বিভক্ত করে দিবে। এক দল জান্নাতে যাবে। তাদের চেহারা থাকবে হাস্যোজ্জ্বল, ঝলমলে। তারা জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হওয়ার পর ফিরিশতাগণ তাদেরকে ইস্তেকবাল জানিয়ে বলবেন—

سلام عليكم طبتم فادخلوها خلدين .

তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। দলে দলে ফিরিশতারা এসে তাদেরকে সালাম জানাবে। এই আনন্দ-উচ্ছাস শেষ না হতেই হঠাৎ আল্লাহ্ পাকের আরশের দরজা খুলে যাবে এবং স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলবেন—

سلام قولا من رب الرحيم

হে আমার বান্দারা! তোমাদের রব স্বয়ং তোমাদেরকে সালাম বলছেন, তোমরা সালাম গ্রহণ করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের সকলের সঙ্গে আল্লাহ্ পাক সরাসরি কথা বলবেন। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সেই আনন্দঘন মুহূর্তটি কতই না সুখকর হবে!

হযরত আইয়ুব (আ.) ক্রমাগত আঠার বছর পর্যন্ত কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। এমন কঠিন ব্যাধি আর কারো হয়েছে কি না সন্দেহ। অবশ্য হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ব্যাধি সম্পর্কে অনেকে একটু বাড়াবাড়ি করে বলেছে যে, তাঁর দেহে কীড়া হয়ে গিয়েছিলো। দেহে কীড়া হওয়ার মত নিকৃষ্ট অবস্থায় কোন নবীকে অবশ্য আল্লাহ্ পাক পতিত করেন না। তবে ব্যাধি খুব কঠিন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গোটা দেহ ব্যাথায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। একসময় আল্লাহ্ পাক তাঁকে সুস্থতা দান করেন। সুস্থতা লাভের পর একদিন কোন এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি অসুস্থতার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, অসুস্থতার দিনগুলো আজকের এই সুস্থতা থেকে অনেক ভাল ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, সে কেমন ? তিনি বললেন, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখন আল্লাহ্ পাক প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে আইয়ুব (আ.)! আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ্ পাকের সেই আওয়াজ যখন আমার কানে পৌঁছাত, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যেত। সেই আওয়াজ আমার গোটা সত্ত্বায় সারাদিন অনুরণিত হতে থাকতো। সেই আবেশ কাটতে না কাটতেই আবার আওয়াজ আসতো—হে আইয়ুব (আ.)! আপনার কি অবস্থা?

এবার ভেবে দেখুন, যখন আরশের দরজা খুলে যাবে এবং মানুষ নিজ চোখে আল্লাহ্ পাককে দেখতে থাকবে। তাছাড়া তখন কারো কোন অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধিও থাকবে না, বরং সেখানে যৌবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকবে পরিপূর্ণ মাত্রায়—সে অবস্থায় যখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, কেমন আছো ? সেই জিজ্ঞাসার আনন্দ যে কত গভীর ও ব্যাপক হবে, তা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়!

সরল পথের পথিক

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আখেরাতের সুখ ও দুঃখের এ দু'টি জীবন সম্পূর্ণই দুনিয়ার জীবনের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম জীবনের ঐ পথ যে পথ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে গোটা পৃথিবীর সকল মানুষকেই হেদায়ত দান করতে পারতেন। ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها আমি ইচ্ছা করলে সকলকে সঠিক পথের দিশা দিতাম।—*সূরা সজদা-১২*। কিন্তু তিনি এভাবে সকলকে হিদায়ত দান করেন নি। শুধু হেদায়ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। فا لهمها فجورها وتقواها মানুষকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।—*সূরা আশ্ শাম্‌স-৮*। وهدينه النجدين আমি মানুষকে দু'টি পথের সন্ধান দিয়েছি।—*সূরা বালাদ-১০*। فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, আর যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।—*সূরা কাহাফ-২৯*। সুতরাং মানুষের সঠিক বা মন্দ পথে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রতিটি কাজ যথার্থরূপে অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

হেদায়তের এই পথ অবলম্বন করার জন্য এমন কোন ফর্মুলা নেই, যে সে ফর্মুলা কার্যকর করার ফলে সকলে অনায়াসে ইসলাম ও জান্নাতের পথে চলতে আরম্ভ করবে। যদি থাকত, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কষ্ট স্বীকার করে মানুষে দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতেন না এবং তাদের হাতে-পায়ে ধরে এত অনুরোধ-উপরোধও করতেন না। আসলে ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষকে শিখে অর্জন করতে হয়। ডাক্তারির কথা বলুন, ব্যবসা-বানিজ্যের কথা বলুন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়া যেমন এগুলো আয়ত্ব করা সম্ভব নয়, ইসলামও ঠিক তেমনি শিখেই অর্জন করতে হয়।

আপনারা যদি আমাকে বলেন যে, মৌলুবী সাহেব! আপনি একজন ব্যবসায়ী হয়ে যান। তাহলে শুধু আপনাদের এই বলার দ্বারাই আমি ব্যবসায়ী হয়ে যাব—এটা অসম্ভব। কারণ গোটা জীবন যেখানে তবলীগের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, ব্যবসার সঙ্গে যার ক্ষীণতম সম্পর্ক নেই, তার পক্ষে শুধু আপনাদের বলা দ্বারা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমার সামনে এই যে যুবকরা বসে আছে, আমি যদি তাদেরকে বলি যে, আগামি কাল তোমরা সকলে ডাক্তার হয়ে যাবে, নাহলে শক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। অথবা যদি বলি, এক কোটি টাকা দেব, আগামি কাল ডাক্তার হয়ে যেও। কিংবা তাদের হাতে-পায়ে ধরে আগামি

কাল ডাক্তার হবার জন্য যতই মিনতি করি না কেন, তাদের পক্ষে কোনভাবেই আগামি কাল ডাক্তার হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ, এটা এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্ক প্রশিক্ষণের সঙ্গে। তা কোনভাবেই জোড়-জবরদস্তি, প্রলোভন বা অনুরোধ-উপরোধ দিয়ে হয় না।

কেউ যদি আম বাগানে চাড়া গাছ রোপন করে পরদিনই গাছের কাছে গিয়ে বলে, আমের বাজার বেশ চড়া, আমাকে চট করে কিছু ফল দিয়ে দাও। আপনারাই বলুন, তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি ? আমের সেই চাড়াটিকে যতই হুমকি-ধমকি দেয়া হোক না কেন, তাতে আম ফলবে না কোনক্রমেই। বরং সেই চাড়া থেকে আম পেতে হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাকে যত্ন করতে হবে। তারপর বলার প্রয়োজন হবে না, তখন বেড়ে ওঠা বৃক্ষ আপনিই ফল দিবে।

আমি কোন ছেলেকে ডাক্তার হয়ে যেতে বললেই সে ডাক্তার হয়ে যেতে পারবে না। এর জন্য তাকে পড়াশোনা করতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তবেই যেয়ে তাকে আমরা ডাক্তার হিসাবে দেখতে পাবো। পাঁচ-ছয় বছর দোকানের পরিবেশে থাকার পরই একটা মানুষ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠতে পারে। দু'-চার বছর চাষবাসের কাজে লেগে না থাকলে কারো পক্ষে কৃষিকর্মে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠা অসম্ভব।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের নীতি হল—তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতিরেকে এখানে কারো পক্ষেই কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামের মত একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শুধু মৌখিক ঘোষণা করে দিলেই মানুষ তা গ্রহণ করে নিবে এবং সে অনুযায়ী নিজের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন পরিচালিত করবে—এমনটি ভাবা অনুচিত। এজন্য বরং পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আসবাব গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

দুনিয়া 'দারুল আস্‌বাব'। এখানে বিভিন্ন উপায়-উপকরণের সাহায্যেই মানুষের জীবন নির্বাহিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে সংঘটিত বিভিন্ন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও 'আস্‌বাব'-এর সহযোগিতায় কার্য-সম্পাদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের সময় তাঁকে বাইতুল্লাহ্ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য সওয়ারী প্রেরণ করা হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে যখন আসমানের দিকে যাত্রা করেন। তখন হযরত জিবরায়ীল (আ.)

তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছেন, এবং সাত আসমান অতিক্রম করে তাঁকে 'সিদরাতুল মুন্তাহায়' পৌঁছে দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে এত লম্বা পাড়ি যিনি দিতে পারলেন, তার পক্ষে নবীজীকে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দেয়া কি সম্ভব ছিল না ? অবশ্যই ছিল। কিন্তু আসবাবের দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক সাধারণত উপায়-উপকরণের সাহায্যেই কার্য সম্পাদন করে থাকেন। কাজেই এখানে তিনি নবীজীর জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছেন।

আর আখেরাত যেহেতু আসবাবের জগত নয়, বরং সেখানে সব কিছুই চলে আল্লাহ্ পাকের কুদরতে। তাই সেখানে সওয়ারী বিহনে তাঁর সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিরাজ শেষে তিনি যখন দুনিয়ায় ফিরে আসলেন, তাঁকে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করানো হয়। বুরাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় সেখানে অবস্থান করছিলো। তিনি বুরাকের পিঠে আরোহণ করে মক্কায় ফিরে আসেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনাটিও নিতান্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য-বর্জিত একজন সাধারণ মানুষের মতই হয়েছিল। রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি এক জন-বিরল পথে মদীনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। শত্রুর ভয়ে পর্বত-কন্দরে আত্মগোপন করেছেন। অথচ আল্লাহ্ পাক চাইলেই হযরত জিবরায়ীল (আ.) এসে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে মদীনায় রেখে আসতে পারতেন। কিন্তু তা করা হয় নি। আসবাবের দুনিয়ায় আল্লাহ্ পাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিটি পদক্ষেপে আসবাবের সহযোগিতাতেই চালিয়েছেন।

তরবিয়তের প্রতিক্রিয়া

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! এসকল ঘটনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক গোটা মানব জাতিকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে, দ্বীন একটি জীবনপদ্ধতি। ইসলাম জীবনের একটি পরিপূর্ণ তরীকা। এটা শুধু নির্দেশ দিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এটা শিখে অর্জন করতে হয়। দ্বীন অর্জন করার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

হযরত হাবীব ইবনে ওমায়ের (রহ.) রোমানদের হাতে বন্দী হওয়ার পর রোম সর্দার তাকে বললেন, তুমি যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নাও তাহলে তোমাকে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব দান করবো। তিনি বললেন, যদি পূর্ণ রাজত্বও দান করো, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না। ফলে রোম সর্দার হযরত হাবীব

ইবনে ওমায়ের (রহ.)-কে একটি গৃহে বন্দী করে তাঁকে বিপথগামী করার জন্য নিজের কন্যাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত রাজকন্যা নিজের রূপ-যৌবন দিয়ে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে গেল। কিন্তু এই তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত হযরত হাবীবের চোখের পাতা ঊর্ধ্বমুখী হলো না। চোখ তুলে এক বারের জন্যও তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন না।

তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা কোথায় পেলেন তিনি ? এটা দ্বীন শিখার ফল। যেহেতু আমাদের তরবিয়ত হয় নি, দৃষ্টিকে নিম্মুখী রাখার শিক্ষা আমরা পাই নি, তাই আমাদের দৃষ্টি অবাধ্য হয়ে বার বার উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। আপনারাই বলুন, একদিকে রোমের আগুনঝরা সৌন্দর্য, অন্যদিকে আরব-মরুর উদ্যাম যৌবন। এই দু'জনের নির্জনতার মাঝে তৃতীয় কোন বাঁধাও নেই। তারপরও কোন্ শক্তিবলে তিনি দ্যুতিময় চরিত্রের অধিকারী হয়ে রইলেন ?

একবার জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নযোগে শয়তানের সাক্ষাত পেয়ে তাকে বললেন, তোমার কোন গোপন বিষয়ে আমাকে অবহিত কর। জবাবে শয়তান বলল, কখনোই কোন বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে বসবেন না। নারী যদি রাবেয়া বসরীর মতও হয়, আর পুরুষ যদি জুনায়েদ বুগদাদী (রহ.)-এর মতও হয়, যদি তারা নির্জনে একত্রিত হয়, তাহলে তাদেরকে গোমরাহ্ করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে যাই।

অথচ এদিকে তিনদিন তিনরাত অতিবাহিত হয়ে গেল, গোমরাহ করবে তো দূরের কথা হযরত হাবীবের চোখ দু'টি একবারের জন্য উপরের দিকে উঠাতেও সক্ষম হলো না। অবশেষে রাজকুমারী ক্লান্ত হয়ে বলতে লাগলো, তুমি পাথর না লোহার তৈরী বলতো ? আমার কোন কৌশলই যে তোমাকে কাবু করতে পারলো না! আমার প্রতি আশক্তি প্রকাশে কে তোমায় বাঁধা দিয়ে রেখেছে ? জবাবে তিনি বললেন, আমার রবই আমাকে বাঁধা দিয়ে রেখেছেন। তিনি আমাকে দেখছেন। সে লজ্জা-ই আমাকে অপকর্ম থেকে বিরত রেখেছে।

শিক্ষা গ্রহণের প্রধান বিষয়

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তাবলীগ উপরোক্ত তরবিয়তেরই মেহনত। এটা কোন ভিন্ন দল বা মতবাদ নয়। কোন ফেরকা বা আন্দোলনও নয়। এ তরবিয়ত গ্রহণ করার পূর্বে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের উপর ওঠে আসা সম্ভব হয় না। এ মেহনতের মাধ্যমে যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্মবাণী মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করবে,

তখন আল্লাহ্র মহান যাত থেকে সব কিছু হওয়া ও কোন মাখলুক থেকে কিছু না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও আখেরাতের স্থায়িত্বের বিষয়টিও প্রকাশ হয়ে পড়বে। একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান যাতই যে সমস্ত কুদরতের মালিক, আর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছাড়া সমস্ত মাখলুকই যে শক্তিহীন, এই বিশ্বাসের নূর গোটা হৃদয়কে আলোকিত করে তুলবে। তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমেই কালিমার এই বাণী মানুষের হৃদয়ে দৃঢ়তা লাভ করবে এবং মানুষের হৃদয়কে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করে তুলবে।

আমাদের হাতকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে।

যবানকে মিথ্যা থেকে হেফাযত করবে।

হারাম থেকে আমাদের চক্ষুকে অবনমিত রাখবে।

হারাম কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে আমাদের পদযুগল বেঁধে রাখবে।

হারাম খাদ্য গ্রহণ করা থেকে আমাদের পেটকে রক্ষা করবে।

তাবলীগ সেই তরবিয়তেরই মেহনত। মানুষের ঈমান যাতে এমন একটা স্তরে উপনীত হয়, যেখান থেকে শুধু মহান রাব্বুল আলামীনের আযমত, হাইবত, জালাল ও জাবারুত ; তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই নজরে আসতে থাকে— এটাই তাবলীগের মেহনত। এই মেহনত ছাড়া কালিমা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করলেও সেখানে দৃঢ়তা লাভ করতে সক্ষম হয় না।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ পাক আমাদের কাছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর আদর্শপুষ্ট একটা জীবন কামনা করেন। অর্থাৎ, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর ঈমান গ্রহণ করার পর আমাদের প্রধান কর্তব্য হল আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা। সেটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর ওঠে আস। তাঁর পবিত্র সীরাতকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ কর। আল্লাহ্ পাকের নিকট মানুষের ধন ও দারিদ্র্যতা, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি মোটেও বিবেচ্য বিষয় নয়। তাঁর নিকট একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল 'তরীকায়ে মুহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যাঁকে আল্লাহ্ পাক মানবিক সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সব চেয়ে পরিপূর্ণ ও সব চেয়ে সম্মানি করেছেন—তাঁর আদর্শের অনুসরণ করা।

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, হে আমার বান্দারা! সব কিছুরই উৎস একমাত্র আমি। তাই আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। আমি দিলেই তোমরা পাবে। আর যা দেব না, কোনভাবেই তা তোমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। তোমাদের যা প্রয়োজন আমার কাছ থেকেই নিতে

হবে। কাজেই, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে নাও। এ তরীকাই জলে-স্থলে সর্বত্র তোমাদের কামিয়াবীর একমাত্র উপায়। এ পথই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কামিয়াবীর রাস্তা। কালো-সাদা, ধনি-দরিদ্র সকলের জন্য সফলতা লাভের একমাত্র উপায়।

আমার কাছে একমাত্র 'তরীকায়ে মুহাম্মদী'-ই গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় আর কোন মত ও পথই আমার নিকট গ্রহনযোগ্য নয়।

একারণেই আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যে, সমস্ত আরবী অভিধানের যাবতীয় শব্দ-ভাণ্ডার প্রয়োগ করেও তাঁর গুণরাশীর যথার্থ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) ও নবীজী (দ.)-এর সৌন্দর্য

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে মিশরের নারীরা আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেদের হাতে ছুরি চালিয়ে দিয়েছিলো। আর আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলে একেবারে নিজেদের বুকেই ছুরি চালিয়ে দিত।

হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আকাশে চোদ্দ তারিখের উজ্জ্বল চাঁদ দিপ্যমান ছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাল-পাড় চাদর গায়ে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমি একবার আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে দেখছিলাম, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখপানে চেয়ে দেখছিলাম। সত্যি বলতে কি, আকাশের চাঁদের চেয়ে নবীজীর পবিত্র মুখের আলোই অধিক উজ্জ্বল ছিল।

মোটকথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান প্রকাশের যথার্থ কোন শব্দই নেই। কিন্তু যেহেতু শব্দই ভাব প্রকাশের মাধ্যম, তাই পূর্ণাঙ্গ না হলেও, যতদূর সম্ভব শব্দ দিয়েই তা প্রকাশ করতে হয়। মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ্ পাকের আযমতের অনুভুতি সৃষ্টি হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযমতের অনুভুতি দিয়ে তার হৃদয় ভরে ওঠবে, তখন হৃদয়ের তাগিদেই সে নবীজীর সুন্নত অনুসরণ করে চলবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাত্র দশ বছরের বালক। আবু তালেব তাঁকে সঙ্গে করে সিরিয়া অভিমুখে চলেছেন বানিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাদের

যাত্রা পথে ছিল বুহায়রা নামক এক পাদ্রির আস্তানা। পাদ্রি কাফেলাটি দেখতে পেয়ে আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করল, এ কাফেলার সরদার কে? আবু তালেব বললেন, আমি। পাদ্রি বললেন, আগামীকাল আপনাদের সকলের দাওয়াত। আবু তালেব অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপার কি? ইতিপূর্বে তো কখনো আপনি এমনটি করেন নি!

যাহোক, পরদিন গোটা কাফেলা দাওয়াতে এসে উপস্থিত হল। সবাই এসে গাছের ছায়ায় বসলো। পাদ্রী একে একে সকলকে পর্যবেক্ষণ করলেন, কিন্তু যাঁকে তিনি খুঁজছেন, উপস্থিত লোকদের মাঝে তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সকলেই কি উপস্থিত হয়েছেন, না কেউ বাকী আছে? তারা বললেন, এক বালক রয়ে গেছে। সে উট চড়াতে গিয়েছে। পাদ্রী বললেন, সে বালকের বরকতেই তো আপনাদেরকে দাওয়াত করেছি। না হলে আপনাদের সঙ্গে দাওয়াত করার মত এমন কি পরিচয় আমার রয়েছে?

বালক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনতে এক লোক ছুটে গেল। নবীজী যখন এসে উপস্থিত হলেন, গাছের ছায়ায় তখন আর কোন জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। ছায়া দখল করে সকলে বসে আছে। ফলে নবীজী রৌদ্রের মধ্যেই বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের একটি শাখা ঝুঁকে এসে নবীজীকে ছায়া দান করতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো মাত্র দশ বছরের বালক। কিন্তু ঐ অবুঝ বৃক্ষ নবীজীকে চিনতে পেরেছিল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা

শীতের রাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। দেখতে পেলেন, হযরত আলী (রাযি.) বাহিরে পেরেশান অবস্থায় পায়চারি করছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আলী! কি হয়েছে তোমার ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় আর বসে থাকা যাচ্ছে না। তখন নবীজীও বললেন, আমারও সেই একই অবস্থা। ক্ষুধার তীব্রতার কারণে ঘরে বসে থাকতে পারছি না। তাই বের হয়ে এলাম। তারা উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, কয়েকজন সাহাবা বসে আছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ? তোমরা বসে আছ কেন ? জবাবে তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ক্ষুধার যাতনায় ঘরে বসে থাকা যাচ্ছিল না। তাই আমরা ভাবলাম, বাইরে গিয়ে গল্প-গুজবে রাতটা কাটিয়ে দেই। তাদের কথা শোনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম